হযরত মু'আবিয়া রা.
জীবনচরিত
নাসীম আরাফাত

হযরত মুয়াবিয়া রা.
জীবনচরিত

নাসীম আরাফাত
উস্তাদ. জামিয়া শরইয়্যা
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঈ.

হযরত মুয়াবিয়া রা. জীবন চরিত

□ প্রকাশক : হাফেয মাওলানা আহমদ আলী
মাকতাবাতুল আখতার

 □ প্রচ্ছদ : হা-মীম কেয়ায়েত
□ কম্পোজ : ব ই ঘ র বর্ণসাজ বাংলাবাজার ঢাকা, ০১৭১১৭১১৪০৯
মূল্য : ৭০ টাকা মাত্র
ISBN : 978-984-8807-09-5

অ র্প ণ

আত্মজ

মুহাম্মাদ, হুমায়রা, আহমাদ
মাহমূদ ও মারযূককে

তোমরা জীবনে অনেক
অ-নে-ক বড় হবে
এই আমার প্রত্যাশা।

– নাসীম আরাফাত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِنْجِيْلِ

অর্থ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মাঝে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাঁদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাঁদের এরূপ অবস্থা উল্লেখ রয়েছে। [সূরা : ফাতাহ, আয়াত ২৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللهَ اَللهَ فِيْ أَصْحَابِيْ.اَللهَ اَللهَ فِيْ أَصْحَابِيْ... لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِيْ، وَمَنْ أَذَانِيْ فَقَدْ أَذَى اللهَ، وَمَنْ أَذَى اللهَ فَيُوْشِكُ أَنْ يَّأْخُذَهُ.

অর্থ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সাবধান! সাবধান!! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সাবধান! সাবধান!! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদের তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। যে তাঁদের মুহব্বত করলো সে আমাকে মুহব্বত করার কারণে তাঁদের মুহব্বত করলো। আর যে তাঁদের ঘৃণা করলো সে আমাকে ঘৃণা করার কারণে তাঁদের ঘৃণা করলো। যে তাঁদের কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। [তিরমিযী]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا، مَّهْدِيًّا وَّاهْدِبِهٖ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– হে আল্লাহ! তুমি মুয়াবিয়াকে হিদায়াত দান কর ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত দান কর। [উসদুল গাবা : ৩ : ৩৮৬]

দু'টি কথা

সেতু ছাড়া যেমন নদীর দু'কুলের মানুষের মাঝে হৃদয়-বন্ধন গড়ে উঠে না, ঠিক তেমনি সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া রাসূল ও তাঁর উম্মতের মাঝে নির্মল ঈমানের বন্ধন গড়ে উঠে না। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের জন্য উম্মতের মধ্য হতে সাহাবীদের নির্বাচন করেছেন। বাছাই করে নিয়েছেন। যাঁরা সাহাবী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন শুধু তাঁদেরই রাসূলের সাহচর্যের সৌভাগ্য দান করেছেন। সাহাবী বানিয়েছেন।

তারপর তাঁদের ঈমানকে আমাদের ঈমানের মানদণ্ড বানিয়েছেন। তাঁদের আমলকে আমাদের আমলের নমুনা বানিয়েছে। দিশেহারা মানুষের হেদায়াতের জন্য তাঁদেরকে মাইলফলক ঘোষণা করেছেন। তাদেরকে হিদায়াতের প্রদীপ্ত তারকা বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের সকলের জন্য আগাম সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। আর দশজনকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

এ কারণে শুরু থেকেই ইসলামের দুশমনরা এ সেতু-বন্ধনকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগেই তারা তাদের নীল নকশা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেছে। সর্বপ্রথম সাবাঈ চক্র এ সেতু-বন্ধনে আঘাত হেনেছে। মুসলিম উম্মাহর মাঝে তাঁদের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়িয়েছে। ফলে শাহাদাত বরণ করেছেন হযরত উসমান রা.। সংঘটিত হয়েছে উষ্ট্রের যুদ্ধ। এরপর এরা খারেজী নামে আত্মপ্রকাশ করেছে ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

এদের শক্ত হাতে দমন করতে অসি হাতে তুলে নিয়েছিলেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.। আঘাতের পর আঘাত হেনে তাদের ষড়যন্ত্রের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। ফলে তারা তাঁর নির্মল চরিত্রে কুৎসিত দাগ লাগাতে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে। বর্ণিল প্রলেপে জঘন্যতম মিথ্যা কথা প্রচার করেছে। তাদের কথা শুনে অনেকে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে। তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। আবার কেউ কেউ প্রবঞ্চিত হয়েছে।

আমাদের দেশেও আজ খারেজীদের অভিশপ্ত প্রেতাত্মারা হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সুভাসিত চরিত্রে কালিমা লেপনে তৎপর হয়ে উঠেছে। নানাভাবে তাঁর চরিত্র হরণে মেতে উঠেছে। সাবাঈদের মত এরাও মুখে ইসলামের কথা বলে। ইসলামী আন্দোলনের বুলি কপচায়– কিন্তু আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের হৃদয় দারুণ কুৎসিত। কালিমালিপ্ত। তাদের কথা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়।

তাই বেদনায় অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মুয়াবিয়া রা.-এর একটি জীবনী গ্রন্থ লিখবো। পাঠকদের মনে তাঁর মহব্বত ও আযমতের বীজ বপন করবো। তাহলে সময়ের তালে তালে তা পত্র-পল্লব আর পুষ্পের সমাহারে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে এবং তাদের সামনে কেউ সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করলে তীব্র ভাষায় তারা তার প্রতিবাদ করবে। সমাজের সামনে তাদের কুৎসিত মুখোশ খুলে দিবে। উন্মোচিত করে দিবে। এভাবে খারেজীদের নব্য প্রেতাত্মাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। সত্যের বিভায় চির উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চির সত্য।

আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলা আমার সেই প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকে কবুল করেছেন। তাই এ গ্রন্থটি লেখার তাওফিক দিয়েছেন। আমার আরো বিশ্বাস, এ গ্রন্থ পাঠে পাঠকদের মন মুয়াবিয়া রা.-এর মহব্বতে বিগলিত হবে। তাদের মনের কালিমা বিদূরিত হবে এবং ঈমানের বলে তারা বলীয়ান হয়ে উঠবে।

আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীত আরয, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে সাবাহায়ে কেরামের মহব্বত ও আযমত দান করেন এবং খারেজিদের এ নব্য প্রেতাত্মাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সরল, সঠিক ও সুন্দর পথে চলার তাওফিক দান করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বিনীত

নাসীম আরাফাত

৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

قَالَ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْلٰى لِلْمُلْكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় আমি মুয়াবিয়া রা.-এর চেয়ে যোগ্য আর কাউকে দেখিনি। [আল ইসাবা : ৪১৩]

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ: فَقِيْلَ لَهُ: أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ؟ قَالَ: كَانُوْا وَاللهِ خَيْرًا مِّنْ مُعَاوِيَةَ وَأَفْضَلَ وَمُعَاوِيَةَ أَسْوَدُ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নেতৃত্বদানে মুয়াবিয়ার চেয়ে অধিক যোগ্য আর কাউকে দেখিনি। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল, তাহলে আবু বকর. উমর, উসমান ও আলী রা.-এর ব্যাপারে কী বলবেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাঁরা মুয়াবিয়ার চেয়ে অধিক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে মুয়াবিয়া নেতৃত্বদানে অধিক যোগ্য। [উসদুল গাবা : ৩/৩৮৬]

সূচিপত্র

এক নজরে মুয়াবিয়া রা.

কে এই মহান সাহাবী

কংকরময় একটি পথ। মদীনার পথ। পথের পাশে মাঝে মাঝে কাঁটাগুল্মের ছড়াছড়ি। দু'একটি খেজুর গাছও অতন্দ্র প্রহরীর মত শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ পথে চলাফেরা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। দূর দেশ থেকে আগমন-প্রত্যাগমন করে বাণিজ্য কাফেলা।

এক দিনের ঘটনা। এ পথ ধরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে সওয়ারির পেছনে তুলে নিলেন এক সাহাবীকে। একেবারে যুবক সাহাবী। বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ হবে। চোখের তারায় তাঁর বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি। ঠোঁটের কোণে তাঁর তৃপ্তির হাসি। সারাক্ষণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পড়ে থাকেন। কোথাও গেলে প্রয়োজন সেরেই আবার তাঁর সাহচর্যে ছুটে আসেন। রাসূলকে ছাড়া কোথাও থাকতে পারেন না।

রাসূল ও সেই সাহাবীকে নিয়ে সওয়ারিটি হেলেদুলে যাচ্ছে। সওয়ারির চোখে মুখেও যেন আজ আনন্দের ঝিলিক। খুশির আমেজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সেই সাহাবীকে বহন করে তার জীবন ধন্য। তার জীবন সার্থক। তাই প্রাণ প্রাচুর্যে আজ তার হৃদয় ভরপুর। আনন্দের আমেজে আজ তার হৃদয় টইটম্বুর। সওয়ারিটি কিছু দূর যাওয়ার পর রাসূলের চেহারায় নির্মল আলোকমালা ছড়িয়ে পড়লো। পেছনেবসা সাহাবীকে বললেন– আচ্ছা বল তো, তোমার শরীরের কোন অঙ্গ আমার শরীরের সাথে লেগে আছে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বিস্ময়কর প্রশ্ন শুনে সেই সাহাবী বিস্মিত। অবাক। ভাব-তন্ময়তায় আত্মহারা। এমন প্রশ্ন তো রাসূল কখনো করেন নি। আজকে হঠাৎ রাসূলের মুখে এমন প্রশ্ন? কেন এ প্রশ্ন? কী তাঁর উদ্দেশ্য? এ ধরনের প্রশ্নের ভিড় তাঁর চোখের তারায়। অবশেষে বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পেট ও বুক

আপনার পবিত্র দেহের সাথে লেগে আছে। নির্জন মরুর বুকে নিরবতা নেমে এল। আর কোন কথা নেই। ক্ষণকাল এভাবেই কেটে গেল। তারপর রাসূলের ওষ্ঠাধর তিরতির করে কেঁপে উঠলো। শিশির স্নিগ্ধ গোলাপ কলি যেমন মৃদু বায়ুর পরশে কেঁপে উঠে। বললেন, হে আল্লাহ! তাকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ ও টইটম্বুর করে দাও।[১]

আরেক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করবেন। তাই এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন। অদূরে কোথাও পানি আছে কি না তা খুঁজছিলেন। সেই সাহাবী রাসূলের ইতিউতি ভাব দেখে বুঝে ফেললেন, তিনি ওযু করার ইচ্ছে করেছেন। ব্যস, আর দেরি নয়। দৌড়ে গিয়ে রাসূলের জন্য ওযুর পানি আনলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুদ্ধিমত্তায় বিমোহিত হলেন। ক্ষণকাল অপলক নেত্রে তাঁর মুখাবয়বের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ওযু করলেন। বললেন– 'শোন, তুমি যদি কখনো শাসক হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।'

সেই সাহাবী বলেন, রাসূলের বিগলিত হৃদয়ের এই আবেগময় কথা শুনে আমার বিশ্বাস হল, নিশ্চয়ই আমি এ পরীক্ষার মুখোমুখি হব। একদিন না একদিন অবশ্যই আমি শাসক হব।[২]

এ ধরনের আরও অনেক দুআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সাহাবীর জন্য করেছিলেন। কারণ, রাসূল তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। খুব মায়া করতেন। অতিশয় আদর করতেন ও ভালোবাসতেন।

পাঠক বন্ধুরা! নিশ্চয়ই সেই সাহাবীর নাম জানতে তোমাদের অন্তর আকুলি-বিকুলি করছে। তাঁকে চিনতে হৃদয় আঁকুপাকু করছে। কে সেই সাহাবী? কি তাঁর নাম? কি তাঁর পরিচয়?

হ্যাঁ..., তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এক চিরন্তন ঐতিহ্য। এক অমর ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.।

---

[১]. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/২৬৭

[২]. আল ইসাবা : ৪১৩, তারিখুল খুলাফা : ১৫৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২৬৪

ইয়েমেনের ভবিষ্যদ্বক্তা

সে অনেক আগের ঘটনা। হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর জন্মের অনেক আগের ঘটনা। কুরাইশের এক সুশ্রী সুপুরুষ যুবক ফাকা ইবনে রবীয়া। তার সাথে কুরাইশের অনন্যা সুন্দরী, বুদ্ধিমতি হিন্দের বিয়ে হল। এরা উভয়ে মক্কার উঁচু পরিবারের সন্তান। ফাকা ও হিন্দের দাম্পত্য-জীবন আনন্দঘন পরিবেশে কেটে যাচ্ছে। সময়ের তালে তালে তরতর করে এগিয়ে চলছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিনের ঘটনা। এক ভুল বুঝাবুঝি তাদের সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত করলো। তাদের মধুময় সময়গুলোকে বিষময় করে তুললো। শুধু তাই নয়, চিরদিনের জন্য উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের তিক্ত রেখা টেনে দিল।

ফাকার বিশাল বাড়ি। বাড়ির বৈঠকখানায় মানুষের অবাধ যাতায়াত। কারো জন্য কোন বাধা নেই। কোন নিষেধ নেই। সবাই স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করে। গল্প-গুজব করে। আনন্দ-স্ফূর্তি করে। তারপর চলে যায়।

একদিন হিন্দ ও ফাকা সেখানে বসে কথাবার্তা বলছিল। অন্য কেউ সেখানে ছিল না। সহসা এক প্রয়োজনে ফাকা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো আর হিন্দ সেখানেই অন্যমনষ্ক হয়ে স্বামীর আগমনের প্রত্যাশায় বসে রইল। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে সেই কামরায় প্রবেশ করলো। যেই দেখল একজন মহিলা বসে আছে, আর দেরি করলো না। সাথে সাথে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

দূর থেকে ফাকা দেখল, হিন্দ যে কামরায় বসে আছে সে কামরা থেকে এক লোক বেরিয়ে গেছে। ব্যস, ফাকার মনে সন্দেহের দানা মুকুলিত হল। ক্রমেই তা পল্লবিত হয়ে উঠল। এগিয়ে এলো হিন্দের নিকট। লাথি মেরে রাশভারী কণ্ঠে বললো, এ কামরা থেকে কে বেরিয়ে গেলো?... তার সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

ফাকার কথায়, কণ্ঠে ও আচরণে চমকে উঠল হিন্দ। আত্মস্থ হয়ে চরম বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো, কই... কেউ তো এখানে আসেনি... তবে মনে হচ্ছে, কেউ যেন এদিকে এসেই চলে গেছে।

ব্যস, ছোট্ট এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলো। ক্রমেই তা ফুলে ফেঁপে এক অসহনীয় রূপ ধারণ করলো। ফাকা

হিন্দকে তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু এতেই শেষ হল না। এক মুখ, দু'মুখ করে মক্কার সর্বত্র এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই তা নিয়ে কানাঘুষা করে। হাস্যরসিকতা করে।

হিন্দের পিতা উৎবা। মক্কার এক সম্মানী ব্যক্তিত্ব। মক্কায় তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি। মেয়েকে নিয়ে কানাঘুষা সে সহ্য করতে পারলো না। একদিন হিন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, মেয়ে আমার! মক্কায় লোকেরা তোকে নিয়ে কানাঘুষা করে। হাসাহাসি করে। আসলে ঘটনা কী? যদি ঘটনাটি সত্য হয় আমাকে বল। গোপনে তাকে হত্যা করে ফেলি। সব আলোচনাই থিতিয়ে যাবে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে চল, ইয়েমেনের কোন ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যাই। কোন জ্যোতিষীর নিকট যাই। সে তোর সত্যবাদিতার কথা ঘোষণা করে দিলেই সবাই তা মেনে নিবে।

হিন্দের আত্মমর্যাদা আকাশ ছুঁইছুঁই। পিতার কথায় দারুণ আঘাত পেল। হৃদয়ে বেদনার রক্তক্ষরণ শুরু হল। অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে কসম খেয়ে নিজের পবিত্রতা ও সূচিতার কথা ব্যক্ত করলো। ফলে উৎবার বিশ্বাস হল, তার মেয়ে নিষ্পাপ। তার মেয়ে নিষ্কলংক ও নির্দোষ। এরপর উৎবা জামাতা ফাকার নিকট গিয়ে বললো, তুমি আমার মেয়ে সম্পর্কে অনেক অপবাদ দিচ্ছ। তাই ইয়েমেনের কোন ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট চল। কে অপরাধী আর কে নিষ্পাপ, তা তিনি বলে দিবেন। তারপর আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো।

মক্কার গলি-গুপচি অতিক্রম করে মরুর বুক চিরে একটি ছোট্ট কাফেলা ইয়ামেনের পথে রওনা হল। কাফেলায় রয়েছে ফাকা ও বনু মাখজুমের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক, হিন্দ, তার পিতা ও তার কয়েকজন সখী। পাহাড়ের পাশ কেটে, লতাগুল্মের পিঠ মাড়িয়ে মরুর পর মরু অতিক্রম করে তারা যখন ইয়ামেনের সীমান্তে পৌঁছলো, তখন হিন্দের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। উৎবা এতে দারুণ বিচলিত হল। বললো, তোমার আবার কী হল? তোমাকে এত বিষণ্ন ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

হিন্দ বললো, আব্বা! আপনি তো আমাকে ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট নিয়ে যাচ্ছেন। আর ভবিষ্যদ্বক্তারা কিন্তু সব সময় সঠিক কথা বলতে পারে না। মাঝে মধ্যে ভ্রান্ত কথাও বলে থাকে। যদি আমার ব্যাপারে ভ্রান্ত কথা বলে

দেয় তাহলে তো আমাকে চিরকাল কলংকের কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আরবের নারীকুল আমাকে আজীবন লাঞ্ছনা দিবে। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। টিপ্পনী কাটবে।

উৎবার গায়ে বিদ্যুতের শক হল। মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় চিন্তা দৌড়ঝাঁপ শুরু করলো। ক্ষণকাল নীরবতায় ডুবে রইলো। ভাবলো। তারপর বললো, বেটি! তার ব্যবস্থা আমি করবো। তোমার বিষয়টি উপস্থাপিত করার পূর্বেই আমি পরীক্ষা করে নেব। দেখবো, কতটুকু তার জ্ঞানের দৌড়। কতটুকু তার বিদ্যার বল। পূর্ণ আশ্বস্ত হলেই তোমার বিষয়টি উপস্থাপিত করবো। সবকিছু ভেবে চিন্তেই করবো। এ নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। বিষণ্ন হয়ো না।

মক্কার সরদার উৎবা। মানুষ চড়ানো তার কাজ। তাই দারুণ ধুরন্ধর। অত্যন্ত চৌকান্না। হাজারো চিন্তার প্যাঁচ সর্বদা তার মাথায় খেলে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তাকে কিভাবে পরীক্ষা করবে? ভাবতে ভাবতে চিন্তাশক্তি যেন খেই হারিয়ে ফেলতে লাগলো।

ভাবনার ঘোরে হঠাৎ তার চিন্তাশক্তিতে সার্চ লাইটের প্রখর আলো জ্বলে উঠল। বেলফুলের নির্মল শুভ্রতা তার চেহারায় ছড়িয়ে পড়লো। হ্যাঁ, এভাবেই পরীক্ষা করতে হবে। দারুণ জমবে। তারপর উৎবা তার ঘোড়ার যৌনাঙ্গের আবরণের নিচে একটি গমের দানা লুকিয়ে রাখল এবং চামড়া দিয়ে তা ঢেকে দিল।

ইয়ামেনী ভবিষ্যদ্বক্তা শুনলো, মক্কার এক সরদার সদলবলে তার আস্তানায় এসেছে। আনন্দ উপচে পড়লো তার হৃদয়ে। এগিয়ে এসে তাদের স্বাগত জানালো। সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করলো। দস্তরখানে খাবার উপস্থিত। সুবাসে চারদিক মৌ মৌ। ভবিষ্যদ্বক্তার সাথে তারা খেতে বসলো। কিন্তু খাবার শুরু করার পূর্বে উৎবা উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমরা এক কঠিন সমস্যা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। তবে সমস্যাটি বলার পূর্বে আপনাকে একটু যাচাই করতে চাই। আচ্ছা, বলুন তো, এখানে আসার পূর্বে আমি কী করে এসেছি?

ভবিষ্যদ্বক্তা কিছুক্ষণ নীরব থেকে অকপটে সব কিছু বলে দিল। উৎবা ভবিষ্যদ্বক্তার কথায় আশ্বস্ত হল। তারপর বললো, আচ্ছা, এখন আপনি এই

মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

ভবিষ্যদ্বক্তা এবার প্রত্যেক মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলো, দাঁড়িয়ে যাও। ক্ষণকাল পর বলতে লাগলো, বসে যাও, তোমার কোন সমস্যা নেই। এভাবে বলতে বলতে হিন্দের পাশে এসে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রেখে বললো, দাঁড়িয়ে যাও। তারপর চোখ বুজে কী যেন ভাবল। তারপর বলতে লাগলো, হ্যাঁ, তুমি একেবারে পূতঃপবিত্র। কোন পাপ কাজই করোনি। কোন তিরস্কারের ভ্রুক্ষেপ করো না। শুনে নাও, তুমি এক শাসক সন্তান জন্ম দিবে। তার নাম হবে মুয়াবিয়া। ভবিষ্যদ্বক্তার কথা শুনে ফাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতবাক। সহসা ছুটে গিয়ে হিন্দের হাত চেপে ধরলো।

হিন্দের আত্মমর্যাদাবোধ এবার তেতে উঠলো। এক ঝটকায় ফাকার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো, না, আর না..., এ জীবন আর তোর সাথে কাটাবো না। আমি কসম করে বলছি, যদি আমি শাসকের মা হই তাহলে সে শাসক তোর মত নিচু লোকের ঔরস থেকে জন্ম হতে পারে না।

এরপর হিন্দ আর ফাকার ঘরে ফিরে যায়নি। তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। স্বামী ফাকার পর হিন্দ আবু সুফিয়ান রা.-এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং আবু সুফিয়ান রা.-এর ঔরসেই হযরত মুয়াবিয়া রা. জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[১]

তাই শিশু মুয়াবিয়াকে নিয়ে আবু সুফিয়ান ও হিন্দ দম্পতির ছিল অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা।

হিন্দের প্রতিবাদ

শৈশবকালের কথা। মিনার পথ ধরে শিশু মুয়াবিয়া রা. তাঁর মায়ের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পাথুরে পথ। সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হয়। হঠাৎ শিশু মুয়াবিয়া রা. হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। এভাবে পড়ে যাওয়ায় হিন্দের খুব

---

[১]. তারীখুল খুলাফা : ১৭৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১১৯

রাগ হল। বললো, উঠ..., তাড়াতাড়ি উঠ। আল্লাহ যেন তোকে আর না তোলেন।

এ পথ ধরে এক বেদুইন কোথাও যাচ্ছিল। মানুষের চেহারার রেখা দেখে অনাগত ভবিষ্যতের বহু কিছু বলে দিতে পারে এ বেদুইন। হিন্দের কথা তার কানে পৌঁছতেই সচকিত হল। ফিরে তাকাল শিশু মুয়াবিয়া রা.-এর মুখ পানে। ফুটফুটে বিমল চেহারা দেখে তার মায়া হল। আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখল। তারপর বিস্মিতকণ্ঠে বললো, এ ছেলে সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলছো! আমি কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই সে তার গোত্রের সরদার হবে।

হিন্দ বেদুইনের কথা মেনে নিল না। চেহারায় অস্বীকৃতি ভাব ফুটে উঠল। বলল, যদি সে আরবের অন্যান্য গোত্রেরও সরদার হতে না পারে তাহলে আল্লাহ যেন তাকে আর না তোলেন।[১]

বেদুইন নিরব হয়ে রইলো। কিছু বললো না। অপলক নেত্রে মা ও ছেলের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে মাথা দুলতে দুলতে গন্তব্য পথে চলে গেল।

আবু হুরাইরা রা. একদিন অতীতের স্মৃতিচারণ করছিলেন। তিনি তখন বললেন, আমি একবার হিন্দকে মক্কায় দেখেছিলাম। তার চেহারা যেন চাঁদের টুকরা। তার সাথে এক বালক খেলছে।

ঠিক তখন একজন লোক তাদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় বালকটির দিকে তাকাল। ক্ষণকাল গভীর দৃষ্টিতে দেখল। তারপর বলল, আমার বিশ্বাস, এ বালকটি বেঁচে থাকলে অবশ্যই তার গোত্রের সরদার হবে।

হিন্দ লোকটির কথা শুনে নীরব রইলো না। হৃদয় চিরে তার প্রতিবাদী কণ্ঠ বেরিয়ে এল। বললো, যদি শুধু তার গোত্রেরই সরদার হয় তাহলে যেন আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন।

বিস্ময় ভরা চোখে লোকটি হিন্দের দিকে মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে থেকে আবার নিজ পথে পা বাড়ালো। সেই বালকটি ছিল মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান।[২]

---

[১]. আল ইসাবা : ৪১২

[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২১

আরেক দিনের ঘটনা। আবু সুফিয়ান রা. বালক মুয়াবিয়ার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, এই যে হিন্দ! দেখ, আমার ছেলের মাথাটি একটু বড় বড় মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই সে তার গোত্রের সরদার হওয়ার যোগ্য হবে।

স্বামীর কথা শুনে হিন্দের কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললো, শুধুমাত্র তার গোত্রের, যদি সে গোটা আরবের সরদার না হয় তাহলে তার মরণ হোক।[৩]

ভাবনার জগতে কিশোর মুয়াবিয়া

মুয়াবিয়া রা. তখন কিশোর। দশ এগারো বছর তাঁর বয়স। এরই মাঝে চিরশান্ত মক্কা অশান্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের ধরে ধরে কাফেররা মারছে। নির্যাতন, নিপীড়ন করছে। নির্যাতিত মুসলমানদের আর্ত চিৎকারে মক্কার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছে।

পিতা আবু সুফিয়ান মক্কার সরদার। প্রায়ই তার ঘরে এসব বিষয়ের খোলামেলা আলোচনা হয়। পরামর্শ সভা বসে। সবাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। গালমন্দ করে। নানা অভিযোগ নিয়ে তার কাছে ছুটে আসে।

আবু সুফিয়ানের বাড়ির অদূরে খাদিজা রা.-এর বাড়ি। মারওয়ার নিকটে। কিশোর মুয়াবিয়া রা. তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেন, তিনি খাদিজার গৃহে যাতায়াত করেন। কিশোর মুয়াবিয়া তখন বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন। কদাচিৎ মক্কার এ পথে সে পথেও দেখেন। বড় ভালো লাগে তার। ভাবেন, নিখুঁত নির্মল সুন্দর চেহারার এই লোকটিকে নিয়ে গোটা শহরে কেন এই হইচই? কেন এই অশান্তি? তাছাড়া তিনি তো অন্যায় কিছু বলেন না। কারো উপর কিছু চাপিয়ে দেন না। যা সত্য ও কল্যাণ মনে করেন তাই বলেন। মানুষকে তাঁরই দিকে আহ্বান করেন।

এরই মাঝে একদিন আবু সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দ ও পুত্র মুয়াবিয়াকে নিয়ে মক্কার বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান একটি গাধায় চড়ে আগে

---

৩. প্রাগুক্ত

আগে যাচ্ছেন। মরুর পথ ধরে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বান শুনতে পেলেন। ফিরে দেখলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে আসছেন। তখন মুয়াবিয়াকে বললেন, মুয়াবিয়া! তুমি নেমে যাও, মুহাম্মদকে তোমার গাধায় উঠতে দাও। মুয়াবিয়া গাধা থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন আর রাসূল তাতে উঠে বসলেন।

একটু চলার পরই রাসূল পেছনে ফিরে তাকিয়ে বললেন, হে আবু সুফিয়ান! হে হিন্দ! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর পুনরুত্থিত হবে। তখন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপাচারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছি, আর আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তোমাদের সতর্ক করছে। তারপর তেলাওয়াত করলেন– 'হা মীম, পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হতে এ কিতাব অবতীর্ণ। এ কিতাবের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধভাবে বিবৃত; জ্ঞানী লোকদের জন্য তা আরবি কুরআন রূপে অবতীর্ণ, সুসংবাদ ও সতর্ককারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না । অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধূম্রকুণ্ড। অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, এসো ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।'

আবু সুফিয়ান বললেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি তোমার কথা শেষ করলে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, শেষ করেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন ও মুয়াবিয়া রা. তাতে আরোহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর হিন্দ তার স্বামী আবু সুফিয়ানকে বিস্মিত হয়ে বললো, এ যাদুকরের জন্য তুমি আমার ছেলেকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে দিলে!?

আবু সুফিয়ান বললেন– না, হিন্দ! আল্লাহর কসম করে বলছি, সে যাদুকর নয়। মিথ্যাবাদীও নয়। তারপর তারা গন্তব্য পথে এগিয়ে চললো।

কিশোর বয়সের এ ঘটনাটি মুয়াবিয়া রা.-এর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। পিতার কথাটি কখনও ভুলতে পারেনি। তাই প্রায়ই তিনি ভাবতেন, যাঁর বিরুদ্ধে এ তো আয়োজন, এ তো ষড়যন্ত্র, তাঁকে তো তিনি

মিথ্যাবাদী বলছেন না। যাদুকর বলছেন না। শান্তি প্রিয় ব্যক্তিরা একের পর এক তাঁর অনুসরণ করছে। শত নির্যাতনেও তারা তাদের নতুন ধর্ম ত্যাগ করছে না। তাহলে আসলে ব্যাপারটা কী? সত্যই কি তিনি নবী? সত্যই কি তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল? এভাবে ভাবতে ভাবতে তিনি খেই হারিয়ে ফেলতেন।

যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হলেন

মুয়াবিয়াকে নিয়ে তার পিতা-মাতার অনেক আশা। অনেক আকাঙ্ক্ষা। অনেক অভিলাষ। অনেক বাসনা। তার কথাবার্তা ও চালচলনে তারা দারুণ মুগ্ধ। তার কার্যকলাপে নেতা নেতা ভাব পরিস্ফুট। যেমন চমৎকার তার কথাবার্তা। তেমন মার্জিত তার চালচলন। তেমনই মনোমুগ্ধকর তার আচার আচরণ।

কিন্তু আরবের পরিবেশ যুদ্ধংদেহী। এদিকে সেদিকে সর্বদা যুদ্ধ লেগেই থাকে। মারামারি কাটাকাটি আর হানাহানি সর্বদা লেগেই থাকে। তাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা হতে হয়। তীরান্দাজী, ঘোড়সওয়ারী, অসি চালনা, বর্শ নিক্ষেপ ইত্যাকার বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। সিদ্ধহস্ত হতে হয়। খ্যাতিমান হতে হয়। তা না হলে চলে না।

আবু সুফিয়ান ও হিন্দ এ ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। তারা তাকে অসম সাহসী বীর যোদ্ধারূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। মুয়াবিয়াও আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে প্রশিক্ষণ নিতে লাগলেন। বড় ভাই ইয়াযিদ এ ব্যাপারে তাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করলেন। সহযোগিতা করলেন। ফলে বেশি দিন গড়াল না। দেখতে দেখতে মুয়াবিয়া অসম সাহসী, বীর যোদ্ধায় পরিণত হলেন। মক্কায় তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। দূর-দূরান্তে তাঁর বীরত্বের আলোচনা হতে লাগলো।

না, কুরাইশদের সাথে নয়

হিজরতের দ্বিতীয় বছর। ধূলিমলিন এক অশ্বারোহী তীর তীব্র গতিতে মক্কায় এসে পৌঁছলো। চলার গতি দেখে সবাই থমকে দাঁড়াল। অশ্বারোহী এসেই তারস্বরে ঘোষণা দিল, সরদার আবু সুফিয়ানের কাফেলা লুণ্ঠিত

হতে যাচ্ছে। মুহাম্মদ ও তার অনুচররা পথ রোধ করে আছে। শীঘ্রই চল, কে যাবে? কে আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে উদ্ধার করবে?

সংবাদটি মরুর দুরন্ত বায়ুর ন্যায় মুহূর্তে মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। সবার চোখে মুখে জিঘাংসার আগুন। হাতে হাতে শানিত তরবারি। ছুটে এলো জীবন দিতে। দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চেপে সবাই ছুটলো মদীনার পানে। শীর্ষ নেতৃত্বে আবু জাহেল। ধূলিঝড় পশ্চাতে ফেলে তারা হারিয়ে গেল মরুর বিস্তৃত বুকে।

সবাই যখন আবু সুফিয়ানকে উদ্ধারের জন্য তীর তীব্র গতিতে ছুটে গেল তখন আবু সুফিয়ানের বীর পুত্র মুয়াবিয়া কিন্তু একেবারে নির্বিকার। একেবারে শান্ত, সমাহিত। চেহারায় কোন আক্রোশের আলামত নেই। উদ্যত কোন ভাব নেই। জিঘাংসার কোন চিহ্ন নেই। অথচ বাহুতে তার অফুরন্ত শক্তি। হৃদয়ে তার দুরন্ত সাহস। যুদ্ধের কলা-কৌশলে সে দারুণ পারঙ্গম।

স্বচ্ছ চিন্তা-ভাবনা তাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করলো। মানসিক দ্বন্দ্ব তাকে পশ্চাতে ফেলে রাখলো। এমনকি পিতাকে উদ্ধারের বিয়ষটিও তাকে উত্তেজিত করলো না। উদ্বেলিত করলো না। তার সিদ্ধান্ত, না, কুরাইশদের সাথে নয়। অন্যায়ের সাথে নয়। সত্যের সাথেই সর্বদা থাকতে হবে। অন্যথায় মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে হবে।

বদরের নির্মম পরাজয় মক্কাবাসীরা হজম করতে পারলো না। সরদার আবু জাহেল, উতবা, শায়বা আরো অনেককে হারিয়ে তারা দিশেহারা। স্বজনহারা পরিবারদের কান্নায় ক্রমেই আকাশ বাতাস ভারী থেকে ভারীতর হতে লাগলো। দাঁতে দাঁত পিষে তারা বলতে লাগলো, অসহ্য! অসহ্য!! অসহ্য!! হে সরদার আবু সুফিয়ান! আমরা এ কাফেলার সমুদয় সম্পদ যুদ্ধ ফান্ডে প্রদান করলাম। আমরা যুদ্ধ চাই। মৃতদের প্রতিশোধ চাই। হৃদয়ের প্রশান্তি চাই। রক্তের বিনিময়ে রক্ত চাই।

সরদার আবু সুফিয়ান আজ লাচার। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে এতগুলো মানুষ মারা গেল! অনেকের আত্মীয়-স্বজন নিহত হল। তাই ঘরে ঘরে আজ কান্নার রোল। মক্কা নগরী আজ শোকাভিভূত। বেদনা বিধুর। সুতরাং নীরবে বসে থাকা যায় না।

আবু সুফিয়ান যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য মক্কার বেশ কিছু মহিলাও প্রস্তুতি নিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দও এ যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নিল। মক্কার অলিতে গলিতে যুদ্ধের আয়োজন। যুদ্ধের আলোচনা। পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন ও অন্যরা যখন রণউন্মাদে উন্মত্ত ঠিক তখন বীর যোদ্ধা মুয়াবিয়া নির্বিকার। প্রাণ থাকতেও নিষ্প্রাণ। সবার সাথে থেকেও একাকী। অসহায়। কেউ তার নেই। সেও কারো নয়। মনের কথা জিহ্বার ডগায় তোলপাড় সৃষ্টি করলেও ব্যক্ত করার পরিবেশ নেই। সুযোগ নেই।

বিশ বছর বয়স তখন মুয়াবিয়ার। শৈশব, কৈশোরের স্মৃতিচারণ করে সে কিছুতেই এ যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারছে না। তার বিশ্বাস, মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জুলুমের মাত্রা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষগুলো এখন রুখে দাঁড়িয়েছে। জীবন-মরণ সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছে। সুতরাং এতে তাদের কোন অন্যায় নেই। কোন অপরাধ নেই।

পঞ্চম হিজরির কথা। মুয়াবিয়া রা. এর বয়স তখন বাইশ বছর। এখন তিনি অনেক কিছু উপলব্ধি করেন। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তার অনেক পরিচ্ছন্ন। একদিন দেখলেন, তাদের বাড়িতে মদীনার এক ইহুদী প্রতিনিধি দল। বড় কুটিল তাদের চেহারা। অত্যন্ত আক্রোশপূর্ণ তাদের কথাবার্তা। তারা তার পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে কথাবার্তা বলছে। সাথে আছে মক্কার বেশ কিছু নেতা। আলোচ্য বিষয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ধর্ম ইসলাম।

ইহুদীদের বক্তব্য, আমরা মদীনায় আছি। আমরা ভেতর থেকে আক্রমণ করবো আর আপনারা বাইরে থেকে আক্রমণ করবেন। এবারের আক্রমণ হবে যৌথ। সম্মিলিত। সাঁড়াশি। আরবের সকল গোত্র আর আমরা ইহুদীরা মিলে চারদিক থেকে আক্রমণ করে নতুন এই ধর্মমতকে একেবারে ধূলিস্মাৎ করে দিব।

ইহুদী প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবে মক্কার নেতৃবৃন্দ একমত হলো। আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও একমত হলো। জেগে উঠলো গোটা আরব। সবাই উত্তেজিত। সবাই মারমুখো। সবার চোখে-মুখে জিঘাংসা আর রক্ত পিপাসার নেশা। শুরু হলো যুদ্ধের আয়োজন। রণ রণ সাজে সজ্জিত গোটা

আরব। দশ হাজার যোদ্ধার বিশাল বাহিনী প্রস্তুত। শীর্ষ নেতৃত্বে আবু সুফিয়ান। ধূলিঝড় উড়িয়ে এ বিশাল বাহিনী মদীনার পানে চললো। মরু আরবের লোকেরা ইতিপূর্বে এত বড় বাহিনী আর দেখেনি।

তাই এ যুদ্ধ যাত্রা গোটা আরবে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করলো। উত্তেজনা সৃষ্টি করল। কিন্তু মুয়াবিয়ার অন্তরে কোন আলোড়ন নেই। কোন উত্তেজনা নেই। কোন আক্রোশ নেই। কাফেরদের মতের সাথে তার মত মিলে না। তাই অন্যায় যুদ্ধে মক্কাবাসীর সাথে তিনি অংশ গ্রহণ করলেন না। নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের সাথে তিনি মক্কায় রয়ে গেলেন।

এ কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর অন্তর, তাঁর হৃদয়, তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা, তাঁর চিন্তা-চেতনা সর্বদা মুসলমানদের সমর্থন করে আসছে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরবে প্রতিবাদ করে আসছে। পিতা-মাতার মতের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদ করে আসছে। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর চিন্তা-চেতনা ও হৃদয় ইসলামে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণে উন্মুখ হয়ে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। ব্যক্ত করতে পারছিল না।

ইসলাম গ্রহণ

ষষ্ঠ হিজরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহ তাওয়াফের জন্য মক্কায় গমন করলেন। সাথে দেড় হাজার সাহাবী। মুহাজির সাহাবী ও আনসার সাহাবী। ইহরাম বেঁধে কুরবানীর উট সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার দিকে এগিয়ে আসছেন। বাইতুল্লাহ জিয়ারত করতে আসছেন। যুদ্ধের কোন চিন্তা নেই। লড়াইয়ের কোন ভাবনা নেই। আসতে আসতে রাসূল মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা ক্ষেপে আগুন। তাদের এক কথা, না-না-না। কিছুতেই তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। প্রয়োজনে যুদ্ধ করবো। প্রয়োজনে জীবন দিব। রক্তের দরিয়া বইয়ে দিব। তবুও তাদের আসতে দিব না। ব্যস, এক কথা। এক সিদ্ধান্ত। অন্য কিছু শুনতে নারাজ।

বিষয়টি গড়াতে গড়াতে অনেক দূর গড়াল। অনেক কিছু ঘটলো। সব

শেষে সুহাইল ইবনে আমেরের প্রচেষ্টায় একটি সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হলো। একটি অশুভ ছায়া আরবের আকাশ থেকে সরে গেল। শান্তির সুশীতল সমীরণ চারদিকে বয়ে গেল।

যখন সবাই অজানা শংকায় আতঙ্কিত। ভয়াতুর। চিন্তাগ্রস্ত। ঠিক তখন অত্যন্ত সন্তর্পণে মুয়াবিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সাহচার্য অবলম্বন করলেন। তৃষ্ণিত হৃদয়কে প্রশান্ত করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সবার অজান্তে সন্তর্পণে মক্কায় ফিরে গেলেন।

তবে পিতা আবু সুফিয়ান ও মাতা হিন্দের প্রভাবে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেননি। ব্যক্ত করতে পারেননি। এ কথাটি তিনি প্রায়ই বলতেন। বলে আনন্দ উপলব্ধি করতেন। বিমুগ্ধ হতেন।[১]

হুনাইনের যুদ্ধ

হাওয়াজিন। একটি শক্তিশালী বেদুইন গোত্র। দীর্ঘদিন যাবত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। তায়েফের অদূরে এক পার্বত্য অঞ্চলে তাদের নিবাস। নানা শাখা প্রশাখায় তারা পল্লবিত। এতদিন মক্কার শাসন ক্ষমতা ছিল কুরাইশের হাতে। আবু সুফিয়ান ছিল তাদের শীর্ষনেতা। তাই হাওয়াজিনরা ছিল নিরাপদ। এখন তারা বিপদ অনুভব করলো। মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠলো এবং আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তায়েফ থেকেও কিছু লোক এসে তাদের সাথে যোগ দিল।

রাসূলের নখদর্পণে সব কিছু। তিনি ভাবলেন, না, শত্রুদের সময় দেয়া যায় না। সাথে সাথে সাহাবীদের নিয়ে রওনা হলেন। মদীনা থেকে আগত দশ হাজার সাহাবীর সাথে মক্কার দু'হাজার নওমুসলিম যোগ দিল। সে এক বিশাল বাহিনী। এ বাহিনী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুটে চললেন। মক্কার নেতৃস্থানীয় অনেকে রয়েছেন রাসূলের সাথে। রয়েছেন আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, নযর ইবনে হারেছ, হাকীম ইবনে হিযাম, আলা ইবনে হারেসা রা.সহ আরো অনেকে। আবু সুফিয়ান রা.

---

১. উসদুল গাবা : ৪/৩৮৫, আল ইসাবা : ৪১২

সারা জীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আজ তিনি সাহাবী। পুত্র মুয়াবিয়াকে সাথে নিয়ে জিহাদে যাচ্ছেন। সত্যের পরশে তাঁর হৃদয় আজ আনন্দিত। পুলকিত। বিগলিত। বিমোহিত। উদ্বেলিত।

এ যুদ্ধের শুরুতে সাময়িকভাবে মুসলমানদের উপর কিছুটা বিপর্যয় নেমে এলেও শেষ পর্যায়ে তারা বিজয় লাভ করলেন। প্রভূত গনিমতের মাল অর্জন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া রা. ও অন্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছে করলেন। তাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রকাশের ইচ্ছে করলেন। তাই তাদের দ্বিগুণ গনিমতের মাল প্রদান করলেন। ফলে আবু সুফিয়ান ও মুয়াবিয়া রা.-এর প্রত্যেকে একশত উট ও চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পেলেন।[১]

তায়েফের যুদ্ধে

তায়েফ। চারদিকে তার সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ। অসংখ্য ঝরনা ছল ছল ছলাৎ রব তুলে বয়ে চলে। গাছে গাছে পাখিরা গান গায়। মন মাতানো শিস দেয়। খেজুর গাছে ঝুলে থাকে কাঁদি কাঁদি খেজুর। চারদিক সুঘ্রাণে মৌ মৌ করতে থাকে। তাই তায়েফের সবাই সচ্ছল। বিত্তবান। জীবনে তাদের কোন অভাব অভিযোগ নেই। রণক্ষেত্রেও তারা অত্যন্ত দুরন্ত দুর্বার। স্থানে স্থানে গড়ে তুলেছে সুরক্ষিত দুর্গ। অত্যন্ত মজবুত কিল্লা। কারো ঘরে তীর, ধনুক, তলোয়ার আর বর্শার অভাব নেই। তীরন্দাজিতে তায়েফের লোকেরা খুবই পারদর্শী। বেশ দক্ষ। অত্যন্ত পারঙ্গম ও খ্যাতিমান।

পরাজিত হাওয়াজিনরা এবার তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং দ্রুত আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছু শুনলেন। ভাবলেন। তারপর তায়েফ গমন করলেন। সাথে আবু সুফিয়ান ও মুয়াবিয়া রা.ও তায়েফে গমন করলেন। তায়েফের অধিবাসীরা দারুণ চৌকান্না। পূর্ব থেকেই তারা প্রস্তুত। দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে মুষলধারায় তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। মুসলমানরা দূর থেকে

---

[১]. হায়াতুস সাহাবা : ২/৯৩

তাদেরকে অবরোধ করে রইলো। মুয়াবিয়া রা. এ যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন। জানবাজ সাহাবায়ে কেরামের মরণপণ যুদ্ধে অবশেষে তায়েফ বিজিত হলো।

আবু সুফিয়ান রা. এক চোখ হারালেন

তায়েফে তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রাণপণ যুদ্ধ। মরণজয়ী যুদ্ধ। আবু সুফিয়ান রা. যুদ্ধ করতে করতে দারুণ ক্লান্ত। শরীরটা নেতিয়ে পড়েছে। মাংশপেশী আর চলে না। প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় একেবারে অতিষ্ট। তাই একটু বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয়ের আশায় একটি দেয়ালের পাশে বসে খাচ্ছিলেন।

সাইফ ইবনে উবাইদ সকাফী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। চোখে তার বাজ পাখির চাউনি। তীরন্দাজে সে দারুণ দক্ষ। তার দৃষ্টি আবু সুফিয়ান রা. -এর উপর পড়ল। আর দেরি করলো না। তূণীর তুলে ধরলো। তীর যোজনা করলো। তারপরই সাঁ সাঁ করে তার তূণীর থেকে একটি তীর উড়ে গেল। সোজা গিয়ে আবু সুফিয়ান রা.-এর চোখে বিদ্ধ হলো। চোখ থেকে রক্তের ধারা ছুটলো। আলোদানকারী চোখ মুহূর্তে আলোহীন হয়ে পড়লো। যন্ত্রণায় আহত পাখির ন্যায় ছটফট করতে লাগলেন আবু সুফিয়ান রা.। কী করবেন? করারই বা আর আছে কী? যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমে এল চিন্তা-চেতনায়।

সহসা একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো তাঁর অধরে। ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। বিষণ্নতায় ভরা তাঁর কণ্ঠ। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আমার চোখ! আল্লাহর রাস্তায় আক্রান্ত হয়েছে। জখম হয়েছে। চির অন্ধ হয়ে গেছে। কাতাদা ইবনে নুফায়েরের চোখের মতো আমার চোখটিও ভালো করে দিন। আলোকময় করে দিন।

আবু সুফিয়ান রা.-এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। মর্মাহত হলেন। হৃদয়ে একটা বেদনার সাইমুম তোলপাড় শুরু করলো। বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি চাইলে আমি দুআ করে দেই। চোখ ভালো হয়ে যাবে। আর তা না চাইলে আপনার জন্য রয়েছে জান্নাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় আবু সুফিয়ান রা.-এর দু'চোখের সামনে জান্নাতের অভাবনীয় দৃশ্যমালা ভেসে উঠলো। নিখুঁত নিটোল তন্বী হুর গেলমান আর নিঝর মালার অপরূপ অপূর্ব দৃশ্যাবলী ফুটে উঠলো। বাগবাগিচা আর জান্নাতের অট্টালিকার দৃশ্যাবলী প্রতিভাত হলো। ফলে দুনিয়ার এ নশ্বর চোখের লোভ শূন্যের কোঠায় নেমে এলো আর জান্নাতের লোভ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। তাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমি জান্নাত চাই। ক্ষণস্থায়ী এ চোখের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি তার চোখটি পায়ের নিচে রেখে পিষে ফেললেন।[১]

রাসূল সা.-এর খিদমতে মুয়াবিয়া রা.

শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে মুয়াবিয়া রা. এখন যৌবনে উপনীত। শৈশবের সত্যের অনুভূতি– উপলব্ধি কৈশোরে এসে হয়েছে অনুরণিত। আর সময়ের তালে তালে তা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। গাঢ় সবুজ পত্র-পল্লবে পল্লবিত। যৌবনে এসে সেই সত্যকেই আঁকড়ে ধরলেন মুয়াবিয়া রা.। হৃদয়ের গভীরে তাকে আগলে নিলেন। পেয়েও না পাওয়ার কষ্ট, বুঝেও না বুঝার বেদনা, দেখেও না দেখার যাতনা বিগত জীবনে তাঁকে অত্যন্ত অস্থির বেচাইন করে রাখত। ইসলাম গ্রহণের পর সে জ্বালা, সে বেদনা, সে অস্থিরতা দূর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন। আত্মসমর্পণ করলেন।

পিতার সাথে হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন। মক্কায় পড়ে রইল তাদের বিশাল হাবেলী, প্রচুর ধন-সম্পদ, ভোগ বিলাসের অসংখ্য অগণিত উপকরণ। সব কিছু উপেক্ষা করে ঈমানের অদম্য আকর্ষণে পিতা ও পুত্র হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. ছিলেন সুশিক্ষিত। হযরত আবু সুফিয়ান রা. বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাঁর শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গোটা আরব জুড়ে হাতেগোনা কয়েকজন মানুষই লেখাপড়া জানত। মুয়াবিয়া রা. ছিলেন তাদের অন্যতম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

---

[১]. আল ইসাবা : ৪১৩, হায়াতুস সাহাবা-২/৯৩

অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানা কথা চিন্তা করলেন। ভাবলেন। অবশেষে তাকে ওহী লিপিবদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব দেয়ার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু তবুও নানা কথা ভেবে জিবরাঈল আ.-এর সাথে পরামর্শ করে দু'জনে মিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি জিবরাঈল আ.-এর নিকট উপস্থাপন করলেন। তখন তিনি বললেন–

اِسْتَكْتِبْهُ فَإِنَّهُ أَمِيْنٌ

আপনি তাকে কাতিবে ওহী রূপে গ্রহণ করে নিন। কারণ সে একজন বিশ্বস্ত মানুষ। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতিবে ওহী রূপে তাকে নির্বাচন করলেন।[২] ওহী লিপিবদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাকে অর্পণ করলেন।

এ ছিল মুয়াবিয়া রা.-এর জন্য দুর্লভ সম্মানের আয়োজন। অত্যন্ত সৌভাগ্যের সূচনা। যা মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন সাহাবীই পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। চির সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার হতে যে সব চিঠিপত্র ও ফরমান বিভিন্ন স্থানের শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করা হতো, তা লেখার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াবিয়া রা.কেই দিয়েছিলেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠিপত্রও লিপিবদ্ধ করতেন।

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতিব বা ওহী লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাদের মাঝে যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। তার পরই ছিল মুয়াবিয়া রা.-এর অবস্থান। তাঁরা উভয়ে দিন-রাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থাকতেন। এ ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিগত কোন কাজ ছিল না।[৩]

---

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২১

৩. আল ইসাবা : ৪১৩

একদিনের ঘটনা। সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবির্ভূত হলেন জিবরাঈল আ.। মুখে তাঁর নিটোল হাসি। তৃপ্তির জ্যোতি। বললেন–

يَامُحَمَّدُ! إِقْرَأْ مُعَاوِيَةَ السَّلَامَ وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا،
فَإِنَّهُ أَمِيْنُ اللهِ عَلٰى كِتَابِهِ وَوَحْيِهِ وَنِعْمَ الْأَمِيْنِ

হে মুহাম্মদ! মুয়াবিয়াকে আমার সালাম পৌঁছে দাও আর তাকে উত্তম উপদেশ দাও। কেননা সে কুরআন ও ওহীর ব্যাপারে আল্লাহর নির্বাচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। সে কতই না উত্তম বিশ্বস্ত ব্যক্তি।[১]

মুয়াবিয়া রা. ছায়ার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেন। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোথাও যান না। ফলে ভোগ বিলাসে লালিত মুয়াবিয়া রা. মদীনায় এসে দারুণ অর্থ সংকটে পড়লেন। খাবারের সুব্যবস্থা নেই। পরনে ঝলমলে কাপড় নেই। আনন্দ উল্লাসের অর্থ নেই। অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করতে লাগলেন। হৃষ্টচিত্তে অম্লান বদনেই তিনি তা গ্রহণ করে নিলেন। এ নিয়ে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। কোন মনোকষ্ট নেই। কোন মনোবেদনাও নেই।

বিত্তহীন মুয়াবিয়া রা.

ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। একজন বিচক্ষণ মহিলা। যেমন রূপবতী তেমনই গুণবতী। হিজরতের প্রথম দিকে অন্যান্য মুসলিম নারীদের মতো তিনিও হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। তাঁর স্বামী আবু আমের হাফছ ইবনে মুগীরা রা.। দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্র এক বিষয়কে কেন্দ্র করে দশম হিজরীতে তাঁকে তালাক দেন।

এ সংবাদ শুনে সবাই বিস্মিত হল। আশ্চর্যান্বিত হল। নানা কথা ভাবল। নানা চিন্তা করল। ইদ্দত শেষে দেখা গেল অন্য পরিস্থিতি। তাঁর রূপ ও গুণে বিমুগ্ধ হয়ে কয়েকজন বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল। প্রস্তাব পাঠালেন আবু জাহাম রা., মুয়াবিয়া রা. ও উসামা ইবনে যায়েদ রা.। একই সময়ে তিন

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২১

জনের প্রস্তাবে ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. বিস্মিত হলেন। চিন্তিত হলেন। কয়েকদিন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন।

অবশেষে ছুটে এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট। কারণ তিনিই তাঁর আশ্রয়কেন্দ্র। তিনিই তাঁর সকল সমস্যার সমাধান কেন্দ্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হৃদয় প্রশান্তির উৎস। তাঁকেই সব কিছু খুলে বলতে হবে। তাই তাঁর থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছু শুনলেন। কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। কপালে চিন্তারেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, শোন, মুয়াবিয়া সহায় সম্পদহীন। বিত্তহীন। আবু জাহাম ঝগড়াটে। বদমেজাযী। তাই এ তিনজনের মাঝে উসামা ইবনে যায়েদকে আমার বিবেচনায় ভাল মনে হচ্ছে। তুমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।[২]

রাসূলের দুআ

বিত্তহীন মুয়াবিয়া রা.। কিন্তু তাতে তাঁর কোন দুঃখ নেই। কোন কষ্ট নেই। জীবনের অনেক সময় অপরিসীম সুখ স্বাচ্ছন্দে কেটে গেছে। বাকি সময়টুকু রাসূলের অতি নিকটে কাটানোই তাঁর প্রতিজ্ঞা। তাঁর হৃদয়ের প্রত্যয়। তাই গভীর মনোযোগ দিয়ে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনেন। আত্মস্থ করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রাসূলুলের ডাকে ছুটে আসেন। বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধি বিবেচনা ও দূরদর্শিতা দেখে বিমুগ্ধ। আনন্দিত। তিনি ভাবেন, নিশ্চয়ই এক সময় মুয়াবিয়া অনুসৃত হবে। ব্যক্তিত্ববান হবে। বহু মানুষ তাঁর কথা নির্দ্বিধায় মানবে। পালন করবে। তাই একদিন বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁর জন্য দুআ করলেন। বললেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَّاهْدِبِهٖ

২. সহীহ মুসলিম

> হে আল্লাহ! হে পরওয়ারদিগারে আলম! তাকে হিদায়ত দানকারী বানিয়ে দিন। হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন এবং তার দ্বারা লোকদের হিদায়াত দান করুন।[১]

আরেক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাজে বিমুগ্ধ হলেন। আনন্দিত হলেন। দুআ করে বললেন–

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِى الْبِلَادِ وَقِهِ الْعَذَابَ

> হে আল্লাহ! তাকে কিতাবুল্লাহর ইলম দান করুন। দেশে দেশে তার প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে দিন। আর তাকে আযাব থেকে মুক্তি দান করুন।[২]

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা. ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর বোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তার ভগ্নিপতি। তাই মুয়াবিয়া রা. প্রায়ই বোনের ঘরে যেতেন। ভাইবোন মিলে নানা কথা বলতেন।

একদিন মুয়াবিয়া রা. উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা.-এর ঘরে গেলেন। দেখলেন, অর্গল বন্ধ। দরজায় করাঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘরে ছিলেন। বললেন, দেখ তো কে এলো?

উম্মে হাবীবা রা. বললেন, মুয়াবিয়া এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসতে দাও। মুয়াবিয়া রা. ভেতরে প্রবেশ করলেন। তখন একটি কলম তার কানে চাপা দেয়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বিস্মিত হলেন। বললেন, মুয়াবিয়া! তোমার কানে ঐ কলমটি রেখেছ কেন?

মুয়াবিয়া রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেদমতের জন্য। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। আনন্দের তরঙ্গমালা বয়ে গেল তাঁর হৃদয়জুড়ে। বললেন, আল্লাহ তোমাকে তার নবীর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহর কসম করে

---

[১]. তিরমিযী ২/২২৪, উসদুল গাবা ৪/৩৮৬

[২]. আন নুজুময যাহিরা : ১/১৩৪, আল ইসতিআব : ৩/১৪০২, তারিখুল খুলাফা : ১৯৪

বলছি, ওহীর ইশারায় তোমাকে কাতিবে ওহী বানিয়েছি। ছোট বড় যা কিছু করি ওহীর ইশারায় করি। আচ্ছা বল দেখি, আল্লাহ যদি তোমাকে খেলাফতের জামা পরিধান করান তাহলে তোমার অবস্থা কেমন হবে?

পাশেই ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ কি তাকে খেলাফতের জামা পরাবেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বিকার। শান্ত। ক্ষণকাল পর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, তবে সে পথে অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে। অনেক বিপদাপদ রয়েছে।

উম্মে হাবীবা রা.-এর শঙ্কিত মন দুরু দুরু কেঁপে উঠল। ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আপনি তার জন্য দুআ করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন–

اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ بِالْهُدٰى وَجَنِّبْهُ الرَّدٰى وَاغْفِرْلَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى

ইয়া আল্লাহ! তাকে হিদায়াত দান করুন। তার থেকে বিপদাপদ দূরে রাখুন। ইহকাল ও পরকালে তাকে ক্ষমা করে দিন।[৩]

রমযান মাস। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা মুষলধারায় রহমত বর্ষণ করেন। অসংখ্য অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মাফ করে দেন। শেষ রাতে আল্লাহ তাআলা মানুষের দুআ বেশি বেশি কবুল করেন।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাতে বিনয়ে বিগলিত হয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ করতেন, মাগফিরাত কামনা করতেন।

ইরবায ইবনে সাবিয়া রা. বলেন, আমি একদা রমযান মাসে রাতের শেষ

---

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৩

প্রহরে সেহরীর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি সেহরী খাওয়ার জন্য ডাকছেন। আর বলছেন–

هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

এসো, মুবারক খাবার খাও...!

তারপর আমি তাকে বলতে শুনলাম, তিনি দুআ করছেন–

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ

ইয়া আল্লাহ! মুয়াবিয়াকে কুরআনের জ্ঞান দান করুন, গণিতের জ্ঞান দান করুন এবং তাকে আযাব থেকে রক্ষা করুন।[১]

ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্তপ্রতীক

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। চারদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। সত্যানুসন্ধানী লোকেরা একে একে ছুটে আসছে মদীনায়। রাসূলের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করছে। মুসলমান হচ্ছে। তারপর সত্যের আহ্বান নিয়ে ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ এলাকায়। নিজ নিজ কবিলায়। নিজ নিজ অঞ্চলে।

ঠিক তখন একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আনন্দ ও বিস্ময় ভাব ফুটে উঠল। ভাবলেন, হাজরামউতের শাহজাদা ওয়ায়েল মদীনায় আসছে? ইসলাম গ্রহণ করবে? ভারি আশ্চর্যের কথা তো!

আরবের প্রাচীন নগরী হাজরামউত। অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী। বিত্তবান নগরী। এ নগরীর অধিবাসীদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত সালেহ আ.কে পাঠিয়েছিলেন। আজও প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন হাজরামউতের মাটি বালি আর ইট পাথরের সাথে মিশে আছে। তাই হাজরামউতের বাদশাহর ছেলে মরুর অসহনীয় দাবদাহ সয়ে, দীর্ঘ ক্লান্তি-ক্লেশ সহ্য করে স্বেচ্ছায় মদীনায় আসা, সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

---

[১]. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২৬৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা এক মুখ দু'মুখ করে গোটা মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। সাহাবায়ে কেরাম ওয়ায়েল ইবনে হাজারকে স্বাগত জানাতে অধীর অপেক্ষায় রইলেন। তৃতীয় দিন সত্য সত্যই ওয়ায়েল তাঁর গোত্রীয় প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হল। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হৃদয় দিয়ে স্বাগত জানালেন। বললেন, আপনার আগমনের তিন দিন পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন।

ওয়ায়েল এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর মজলিসে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখেই রাসূলের চেহারা আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নিজের চাদর মাটিতে বিছিয়ে তাকে বসতে দিলেন। উপস্থিত সবাইকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মসজিদের মিম্বারের চারপাশে সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হলেন। রাসূল ওয়ায়েলকে নিয়ে মসজিদে গমন করলেন। মিম্বারে বসে হামদ ও সালাতের পর বললেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هٰذَا وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ، أَتَاكُمْ مِنْ بِلَادٍ بَعِيْدَةٍ مِّنْ بِلَادِ حَضَرَ مَوْتٍ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ الْمُلُوْكِ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ يَا حَجَرَ وَفِىْ وَلَدِكَ

হে লোক সকল! এই তো তোমাদের মাঝে ওয়ায়েল ইবনে হাজার দূর দেশ থেকে আগমন করেছে। সুদূর হাজরামউত থেকে এসেছে। স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছে। সে হাজরামউতের বাদশাহদের অবশিষ্ট প্রজন্ম। হে হাজার! আল্লাহ তোমার মাঝে বরকত দান করুন এবং তোমার সন্তান-সন্ততির মাঝে বরকত দান করুন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে পড়লেন। মদীনা থেকে বেশ কিছু দূরে একটি সুন্দর বাড়ি। রাসূল সেখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাবে? চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন। অবশেষে মুয়াবিয়া রা.-এর উপর এসে

তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ভাবলেন, হ্যাঁ, মুয়াবিয়াই বুদ্ধিমান। চৌকস। তাকেই এ দায়িত্ব দিতে হবে। তাছাড়া মুয়াবিয়া রা. আরবের শীর্ষস্থানীয় নেতা আবু সুফিয়ানের শিক্ষিত পুত্র। মার্জিত তার আচার-আচরণ। মনোমুগ্ধকর তার কথাবার্তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াবিয়া রা.কে ডাকলেন এবং ওয়ায়েলকে সেই বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিলেন।

দুপুরের খাঁ খাঁ রোদ। মরুর বালি পুড়ে আগুন হয়ে গেছে। এই অগ্নিময় দুপুরে অতি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হতে সাহস করে না। মুয়াবিয়া রা. সেই অগ্নিময় দুপুরে শাহজাদা ওয়ায়েলকে নিয়ে রওনা হলেন। ওয়ায়েল উটের পিঠে বসে আছে আর মুয়াবিয়া রা. বাহনের লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

নওমুসলিম ওয়ায়েল। শাহজাদার অহংকার আর গর্বের উত্তাপ এখনও তার মাথা থেকে দূর হয়নি। বংশীয় কৌলিন্যের দর্প আর বড়াইয়ের ঝাঁজ এখনও তার চরিত্র থেকে মিলিয়ে যায় নি। তাই মুয়াবিয়াকে উটের পিঠে তুলে নিল না।

কিছুদূর যাওয়ার পর মুয়াবিয়া রা. অগ্নিময় বালিতে আর পা ফেলতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছে, পায়ের তলা পুড়ে যাচ্ছে। তখন একেবারে অনন্যোপায় হয়ে বললেন, ভাই ওয়ায়েল! মরুর অগ্নিময় বালিতে আমার পায়ের তলা পুড়ে যাচ্ছে। আমাকে তোমার উটের পিঠে তুলে নাও।

অহংকারে ভরা ওয়ায়েলের মাথার টিস্যুগুলো। বলল, আমার উটের পিঠে তোমাকে বসিয়ে নিতে কোন আপত্তি নেই। তবে তুমি তো আর শাহজাদা নও। তাই তোমাকে তুলে নেয়া আমার জন্য অপমান।

মুয়াবিয়া রা. এতে ক্ষিপ্ত হলেন না। ধৈর্য ধরলেন। সহ্য করলেন। বিনীকণ্ঠে বললেন, আচ্ছা যদি তাই হয়, তাহলে অন্তত তোমার জুতা দুটি দাও। তা পরে আমার পা দুটিকে অসহনীয় উত্তাপ থেকে বাঁচাই।

মুয়াবিয়া রা.-এর বিনয়ভরা কথাতে তার হৃদয় বিগলিত হল না। বলল, জুতা দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি তো রাজা-বাদশাহদের পোশাক পরার মতো লোক নও। তাই তোমাকে তা দেয়া আমার জন্য অপমান।

মুয়াবিয়া রা. তার এ নিষ্ঠুর আচরণের কোন প্রতিবাদ করলেন না।

প্রতিউত্তর করলেন না। নীরবে সব কিছু হজম করলেন। তাঁর লক্ষ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া দায়িত্ব পালনে যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাই অগ্নিময় মরুর বালু মাড়িয়ে তিনি ওয়ায়েলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

এরপর ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর চলে গেল। বহু ঘূর্ণিপাক বয়ে গেল আরব মরুর ধূলিকণা উড়িয়ে। মুয়াবিয়া রা. তখন গোটা ইসলামী বিশ্বের অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব। আমীরুল মুমিনীন। খলীফাতুল মুসলিমীন। তাঁর ইশারায় গোটা ইসলামী জগত থমকে দাঁড়ায়। অমুসলিম রাজা বাদশাহরা থরথর করে কাঁপে।

একদা এক বিশেষ প্রয়োজনে ওয়ায়েল ইবনে হাজার রা. মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট এলেন। ওয়ায়েল রা.কে দেখে মুয়াবিয়া রা.-এর হৃদয় দর্পণে পুরনো দিনের কিয়ামত সদৃশ সেই ভয়াবহ স্মৃতির কথা ভেসে উঠল।

কিন্তু ক্ষমা ও সহনশীলতার মূর্তপ্রতীক মুয়াবিয়া রা.। তিনি তার সাথে রূঢ় আচরণ করলেন না। অশালীন ব্যবহার করলেন না। সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। নিজের আসনের পাশে নিয়ে তাঁকে বসালেন। যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করলেন। আরবীয় মেহমানদারীর পূর্ণ কৌলিন্য বজায় রেখে তাঁর সমাদর করলেন।[১]

রাসূল ডাকলেন মুয়াবিয়া রা.কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের সর্বযুগের সবচে' বিজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন সাহাবীদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। তাই রাসূল সাধারণত সব কাজেই সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন।

এক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিষয়ে আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর পরামর্শ চাইলেন।

বিষয়টি জটিল, তাই সাহাবীদ্বয় তাঁদের স্বভাবজাত ভদ্রতা বজায় রেখে

---

[১]. হায়াতুস সাহাবা : ৩/১০০, তারিখে ইবনে খুলদুন : ৬/৮৩৫, আল ইসতিয়াব তাহতাল ইসাবা : ৩/৬৫

উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সমধিক জ্ঞাত।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও! মুয়াবিয়াকে ডেকে আন।

রাসূলের এই নির্দেশে বিস্ময় বোধ করলেন আবু বকর ও উমর রা.। বিনীত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহর রাসূল ও কুরাইশের দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মাঝে কি এমন বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা নেই যে, তারা তাদের সমস্যায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, তাই রাসূল কুরাইশের এ যুবককে ডেকে পাঠালেন!

রাসূল তাদের কথা শুনে নীরব রইলেন। কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, যাও, মুয়াবিয়াকে ডেকে আন।

রাসূলের নির্দেশ শিরোধার্য। চির অলঙ্ঘনীয়। তাই মুয়াবিয়া রা.কে ডেকে আনলেন। মুয়াবিয়া রা. এসে রাসূলের সামনে দাঁড়ালেন। রাসূল তখন আবু বকর ও উমর রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন–

أَحْضِرُوْهُ أَمْرَكُمْ وَأَشْهِدُوْهُ أَمْرَكُمْ، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِيْنٌ

তার সামনে তোমরা তোমাদের সমস্যাটি উপস্থিত কর। তোমাদের বিষয়টি পেশ কর। কারণ নিশ্চয়ই সে পরামর্শ দানে সক্ষম ও বিশ্বস্ত।[১]

রাসূলের ইন্তেকাল ও মুয়াবিয়া রা.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে, অপার স্নেহে মুয়াবিয়া রা.-এর জীবন স্বপ্নের মতো তরতর করে কেটে যেতে লাগল। এক এক করে তিনটি বছর কেটে গেল। নানা কষ্ট-যাতনা, প্রচণ্ড অর্থ সংকট সত্ত্বেও তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি জান্নাতী সুখে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধুময় কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। আমলে পরিণত করেন। আবার শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। সর্বদা হৃদয় তাঁর পিপাসার্ত। অন্তর তাঁর তৃষ্ণার্ত। এ পিয়াসা যেন শেষ হবে না। এ তৃষ্ণা যেন দূর হবে না।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৫, মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১/২৫৬

দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হল। মুয়াবিয়া রা.-এর বয়স তখন সাতাশ বছর। রাসূলকে হারিয়ে তিনি ব্যাকুল ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। নির্বাক, নিস্প্রাণ হয়ে পড়লেন। যে হৃদয়ের পরতে পরতে রাসূলের মহব্বত মিশে গেছে সে হৃদয় কি সহজে এ বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করতে পারে?

মুয়াবিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কতটুকু মহব্বত করতেন, কতটুকু ভালোবাসতেন তা কিছুটা অনুধাবন করার জন্য একটি ঘটনা বলছি। হৃদয় দিয়ে শোন।

মুয়াবিয়া রা.-এর খেলাফতকালের কথা। শুনতে পেলেন, বসরায় একজন সাহাবী থাকেন। তাঁর দৈহিক গঠন প্রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো, নাম কারেস ইবনে রবীয়া রা.। এ কথা শুনেই মুয়াবিয়া রা.-এর অন্তরে অদম্য এক চাঞ্চল্য ভাব সৃষ্টি হল। রাসূলের নানা স্মৃতি তাঁর চোখের তারায় ভেসে উঠল। তিনি অস্থির বেকারার হয়ে পড়লেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। সাথে সাথে বসরায় গভর্নরের নিকট দূত পাঠালেন। সংবাদ দিলেন, কারেস রা. যেন অনতিবিলম্বে দামেস্কে এসে আমার সাক্ষাত করে।

কারেস ইবনে রবীয়া রা. সংবাদ পেয়ে দামেস্কে এলেন। মুয়াবিয়া রা. তাঁকে পেয়ে আনন্দে অধীর। উল্লাসে আটখানা। নিজ আসন ছেড়ে নেমে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কপালে চুমু খেলেন।

দু'জন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বললেন। আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে মুয়াবিয়া রা. তাঁকে বিদায় জানালেন।[২]

বীর যোদ্ধা মুয়াবিয়া রা.

ইয়ামামার যুদ্ধে

আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু হানীফা। এ গোত্রের এক প্রভাবশালী সরদার মুসায়লামা। রাসূলের ইন্তেকালের পর তার নবী হওয়ার খাহেশ হলো। সে

---

২. হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখী হাকায়েক : ২৫৭

নিজেকে নবী বলে দাবী করলো। আর তার গোত্রের লোকেরা অন্ধবিশ্বাসে তাকে নবী বলে মেনে নিল।

আবু বকর রা. তখন খলীফা। তিনি এই ভণ্ড নবীকে দমন করার জন্য প্রথমে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ইকরামা ইবনে আবু জাহেল রা. কে পাঠালেন। বলে দিলেন, শুরাহ বিন ইবনে হাসানা রা. তাঁর বাহিনী নিয়ে আসার পূর্বে যুদ্ধ শুরু করবে না।

কিন্তু ইকরামা ইবনে আবু জাহেল একাই তাঁর বাহিনী নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। পরাজয়ের গ্লানি নেমে এলো মুজাহিদ বাহিনীর উপর।

তারপর আবু বকর রা. শুরাহবিল ইবনে হাসানা রা. কে পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন, খালিদ ইবনে ওলীদ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু অপেক্ষা করা আর হলো না। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুজাহিদ বাহিনী পশ্চাতে সরে আসতে বাধ্য হলো। পরাজয় হবে হবে অবস্থা। দারুণ দুঃসময়। অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্ত।

ঠিক তখন ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন খালিদ ইবনে ওলীদ রা.। সাথে দুর্ধর্ষ মুজাহিদ বাহিনী। শুরাহবিলের বাহিনী লুপ্তপ্রায় মনোবল ফিরে পেল। ঘুমন্ত সিংহ যেন হুংকার ছেড়ে জেগে উঠলো।

শুরু হলো যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মরণপণ যুদ্ধ। রক্তে রক্তে ভেসে গেল ইয়ামামার প্রান্তর। পরাজয় নেমে এলো মুসায়লামার বাহিনীর উপর। কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে পালাতে চাইল মুসায়লামা। কিন্তু ওহসী রা. তাকে দেখলেন। অব্যর্থ বর্শা ছুড়ে মারলেন। বক্ষ ভেদ করে চলে গেল সেই বর্শা। সাথে সাথে আরও কয়েকজন মুজাহিদ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। মুয়াবিয়া রা. ছিলেন তাদের অন্যতম। ইসলামের এই ঘোর শত্রুকে হত্যা করতে তিনিও অংশ গ্রহণ করলেন।[১]

ভূপাতিত হলো ভণ্ড নবী। চির ম্লান হলো তার স্বপ্নীল স্বপ্ন। বিজয়ী বেশে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মদীনায় ফিরে এলেন মুয়াবিয়া ও তাঁর ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২১

ইয়ারমুকের যুদ্ধে

ইয়ারমুকের বিশাল প্রান্তর। এক প্রান্তে রোমান বাহিনী। দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার তাদের সৈন্য সংখ্যা। অপর প্রান্তে মুসলিম বাহিনী। তাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। খালিদ ইবনে ওলীদ রা. ইরাক অভিযান থেকে ছুটে এলেন শামের রণপ্রান্তরে। তিনি হলেন এ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। এ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। বাম পাশের মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.। তাঁর অধীনে ছিলেন মুয়াবিয়া রা.।

এ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান রা. কে গোটা বাহিনীর ঘোষক নির্ধারণ করা হল। তিনি ঘুরে ঘুরে মুজাহিদদের মাঝে বক্তৃতা দিতেন ও তাদের উত্তেজিত করতেন।[২]

আবু সুফিয়ান রা.-এর মেয়ে জুয়াইবিয়া রা.। তাঁর মনে জিহাদের নেশা। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার অসীম তামান্না। তিনিও স্বামীকে নিয়ে ছুটে এলেন ইয়ারমুকের প্রান্তরে।

আবু সুফিয়ান রা.-এর স্ত্রী হিন্দ রা.। তিনিও পেছনে পড়ে রইলেন না। মুসলিম নারীদের সাথে তিনি মুজাহিদদের উৎসাহিত করতেন। উদ্বেলিত করতেন। বলতেন, হে মুসলিম ভাইয়েরা! এ খৃষ্টানদের ছেড়ে দিয়ো না। পালানোর সুযোগ দিয়ো না।

ইয়ারমুকের এ ভয়াবহ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান রা.-এর পরিবারের প্রায় সকলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত জুয়াইবিয়া রা. শাহাদাতের শরাবান তহুরা পান করে সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালে আবু সুফিয়ান রা.-এর অপর চোখে তীর বিদ্ধ হল। ফলে তাঁর দ্বিতীয় চোখটিও অন্ধ হয়ে গেল।

আর ইয়াযিদ ও মুয়াবিয়া রা. মরণপণ যুদ্ধ করে ইতিহাসের পাতায় চির অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন। এক অসামান্য মর্যাদা লাভ করলেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী মরণপণ যুদ্ধ করে অবশেষে বিজয়-মাল্য ছিনিয়ে আনেন। এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ

---

২. খেলাফতে রাশেদা : ৭৩

করে। লাখ লাখ সৈন্য ফেলে রোমান বাহিনী প্রাণ নিয়ে ইয়ারমুকের প্রান্তর থেকে পালিয়ে যায়। তারা ফিলিস্তিনে এন্টিয়কে, আলেপ্পায়, জাযিরায় ও আরমেনিয়ায় পালিয়ে যায়। দিকভ্রান্ত তাড়া খাওয়া পশুর ন্যায় তারা পালিয়ে যায়।

মারজুস সুফারের যুদ্ধে

অবরুদ্ধ দামেস্ক নগরী। মুজাহিদ বাহিনী ঘিরে আছে তাকে। এ নগরীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো রোমান বাহিনী। বিশাল বাহিনী।

সর্বাধিনায়ক খালিদ ইবনে ওলীদ রা. সংবাদ পেলেন। গুপ্তচররা বললো, রোমান বাহিনী এখন মারজুস সুফারের বিশাল প্রান্তরে অবস্থান করছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পরামর্শ সভা ডাকলেন। সিদ্ধান্ত হলো, সেখানে গিয়েই তাদের আক্রমণ করতে হবে। দামেস্কের চারপাশে কিছু মুজাহিদ রেখে তাঁরা ছুটে চললেন মারজুস সুফারে। সাথে বীর যোদ্ধা আবু উবায়দা রা., ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা., মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. আরো অনেকে। এসে দেখলেন দশ হাজার রোমান সৈন্য। প্রায় সবাই অশ্বারোহী। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। অন্যান্যের ন্যায় মুয়াবিয়া রা. বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অব্যর্থ আঘাতের পর আঘাতে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে সামনে এগিয়ে চললেন। রণাঙ্গনের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। নিহতদের রক্তে নদীর পানি লালে লাল হয়ে গেল।

অবশেষে মুজাহিদ বাহিনীর প্রবল প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে মুয়াবিয়া রা. সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন, বীর যোদ্ধা খালিদ ইবনে সাঈদ রা. শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর ওষ্ঠ-প্রান্তে লেগে আছে পরম তৃপ্তির সুমিষ্ট হাসির ঝিলিক। পাশে পড়ে আছে তাঁর প্রিয় তরবারী সম্‌সমা। তিনি তা নিজের হেফাজতে নিয়ে নিলেন।

পশ্চিমাকাশে ক্লান্ত সূর্য। রোমান সৈন্যরা দিশেহারা। হতবুদ্ধি। যে যেভাবে পারলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগলো। রণপ্রান্তরে পড়ে রইলো পাঁচ শত নিহত সৈন্য। বন্দী হলো আরও পাঁচ শত। বিজয়ী মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মুয়াবিয়া রা. আবার দামেস্কের রণাঙ্গনে ফিরে এলেন।

বিজিত দামেস্ক

দামেস্কের কিল্লার শীর্ষে ইসলামী পতাকা পত পত করে উড়ছে। ভীতু রোমানরা দামেস্ক ছেড়ে চলে গেছে। তবে পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় শহর ও অঞ্চলগুলোতে এখনও তারা ওৎ পেতে বসে আছে। যে কোন সময় বড় ধরনের আক্রমণ হতে পারে। আবার পরাজয়ের অমানিশা নেমে আসতে পারে।

বৈরুতে আক্রমণ

মুজাহিদ বাহিনীর বিজয় যাত্রা অব্যাহত রেখে গোটা শামকে বশীভূত করতে ইচ্ছে করলেন সর্বাধিনায়করা। তাই ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. কে পাঠালেন। উপকূলীয় অঞ্চল পদানত করতে নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.। এ বাহিনীর অগ্রগামী দলের শীর্ষে মুয়াবিয়া রা.। তিনি ছুটে চললেন সবার আগে আগে। ধূলি ঝড় উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছেন। মরুর তেপান্তর পেরিয়ে লেবাননের পর্বতমালা ডিঙ্গিয়ে বৈরুতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বৈরুতের অধিবাসীরা নগর প্রাচীর বন্ধ করে দিল। অবরোধ করলেন মুয়াবিয়া রা.।

কিছু দিন যেতে না যেতেই পদানত করলেন বৈরুত। রোমানদের সেখান থেকে বের করে দিয়ে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করলেন।

সৈদার উপকণ্ঠে

বৈরুত পদানত করার পর ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. বৈরুতের দক্ষিণে অবস্থিত উপকূলীয় শহর সৈদা আক্রমণের ইচ্ছে করলেন। তাই দুর্ধর্ষ অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে ছুটে চললেন মুয়াবিয়া রা.। ছুটতে ছুটতে সৈদার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন। মুজাহিদ বাহিনী এবার প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেন।

কিন্তু রোমান বাহিনী বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। শহরে ঢুকে নগর প্রাচীর বন্ধ করে দিল। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. নিশ্ছিদ্র অবরোধ গড়ে তুললেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। কয়েক দিনের মধ্যে সৈদা নগরীর পতন ঘটল। এরপর শহর থেকে রোমানদের বের করে দিয়ে সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করলেন।

জাবীল আক্রমণ

ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. তাঁর গতি উত্তর দিকে ফিরালেন। সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত জাবীল পদানত করতে হবে। অগ্রগামী দলের নেতৃত্ব নিয়ে আবার মুয়াবিয়া রা. ঘোড়া ছুটালেন। বৈরুতে এসে পৌঁছলেন। বৈরুত পশ্চাতে ফেলে আরো উত্তরে ছুটে চললেন। এসে পৌঁছলেন জাবীলের উপকণ্ঠে। সমুদ্রের কোল ঘেষে এক চমৎকার নগরী। অত্যন্ত মজবুত নগরী। একটি উঁচু কিল্লাও যেখানে বিদ্যমান। নগর প্রাচীর গড়ে তুলল। পানি পৌঁছার সব পথ বন্ধ করে দিল।

অবশেষে জাবীলের অধিবাসীরা নিরাশ হয়ে সন্ধি করতে এগিয়ে এল। পতন ঘটল জাবীল নগরীর। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর নেতৃত্বে মুয়াবিয়া রা. এ নগরী থেকেও রোমানদের বের করে সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করলেন।

আরকা আক্রমণ

তারপর মুয়াবিয়া রা.কে লেবাননের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. দামেস্কে ফিরে এলেন।

এবার মুয়াবিয়া রা. অধীনস্ত মুজাহিদ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আরও উত্তরে ছুটে চললেন। সমুদ্রোপকূল ধরে চলতে চলতে ত্রিপলীতে এসে পৌঁছল। কিন্তু ত্রিপলী রোমানদের এক মজবুত শক্তিশালী ঘাঁটি। এটা অত্যন্ত সুরক্ষিত নগরী। ত্রিপলী আক্রমণে চাই আরও শক্তিশালী বাহিনী। আরও দুর্ধর্ষ মুজাহিদ দল। তাই ত্রিপলীর পাশ কেটে আরও উত্তরে চলে গেলেন। সোজা আরকায় উপস্থিত হলেন। সেখানে কোন অবরোধের প্রয়োজন হলো না। অনায়াসে আরকা পদানত করলেন।

এভাবে মুয়াবিয়া রা. তাঁর বাহিনী নিয়ে একের পর এক উপকূলীয় শহরগুলো পদানত করলেন এবং সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা মজবুত ও দৃঢ় করতে মনোনিবেশ করলেন। এরপর তিনি দামেস্কে ফিরে এলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের রণাঙ্গনে

বাইতুল মুকাদ্দাস। নবীদের শহর। ওহীর অবতরণ ক্ষেত্র। হযরত দাউদ আ. এ শহরের গোড়া পত্তন করেন আর সুলাইমান আ. এর পরিসমাপ্তি ঘটান।

আর মাসজিদে আকসা হলো নবীদের ঘর। নবীরা সেখানে বসবাস করতেন। এ ঘরের এক বিগত জায়গাও এমন পাবে না যেখানে নবীরা নামায পড়েননি বা সিজদা করেননি।

নাতিশীতোষ্ণ এ শহরে ফলফলাদির শেষ নেই। ঝর্ণার স্বচ্ছ নির্মল সুমিষ্ট পানিরও কমতি নেই। তাই প্রাচীনকাল থেকে এ শহর রোমানদের অত্যন্ত প্রিয় শহর। অত্যন্ত পছন্দের শহর। এ শহরকে রক্ষার জন্য তারা তৈরি করেছে মজবুত নগরপ্রাচীর, বিরাট দুর্গ। তাতে সঞ্চিত রেখেছে অগণিত অস্ত্র। আর দুর্গে অবস্থান করে বিশাল বাহিনী। রোমানদের নিকট দামেস্কের পরই এ শহরের অবস্থান। এটা প্রশাসনিক এক গুরুত্বপূর্ণ শহর।

আমর ইবনে আস রা. এ শহর পদানত করার ইচ্ছে করলেন। ছুটে এলেন মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে। অবরোধ করলেন বাইতুল মুকাদ্দাস। ছুটে এলেন আবু উবায়দা রা.। সাথে তাঁর বিশাল বাহিনী। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. ও মুয়াবিয়া রা.ও এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। অবরোধ কাল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। পরিস্থিতির অবনতি ঘটল।

শহরে ভয়-ভীতি আর হতাশার ছড়াছড়ি। চুপসে গেছে শহরবাসীর অন্তর। তারা শাসককে সন্ধি করতে চাপ সৃষ্টি করলো। শাসক আতরাবুন এলো সন্ধি করতে। আবু উবায়দা রা.-এর সাথে দীর্ঘ কথা হলো। এক পর্যায়ে আতরাবুন বললো, তোমরা বিশ বছর অবরোধ করে রাখলেও এ শহর পদানত করতে পারবে না। কারণ এ শহর এমন এক ব্যক্তি পদানত করবে যার গুণাবলী আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। আর তোমার মাঝে সে গুণাবলী নেই। এরপর আতরাবুন উমর রা.-এর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করলো।

আবু উবায়দা রা. তাঁর কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, কাবার শপথ

করে বলছি, তাহলে বাইতুল মুকাদ্দাস আমরা পদানত করে ফেললাম।

সেনাপতি আবু উবায়দা রা. এর চিঠি পেয়ে উমর রা. বাইতুল মুকাদ্দাসে ছুটে এলেন। মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতিরা এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সন্ধিপত্র লেখা হলো। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন খালিদ ইবনে ওলীদ রা., আমর ইবনে আস রা., আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.। এ সময়ে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে পালন করেছিলেন।

কায়সারিয়ার অভিযানে মুয়াবিয়া রা.

আবু উবায়দা রা.-এর ইন্তেকালের পর ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. সতের হাজার মুজাহিদ নিয়ে কায়সারিয়ায় আক্রমণ করেন। মুয়াবিয়া রা.ও এ যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হঠাৎ শামে ভয়াবহ মহামারি ছড়িয়ে পড়লো। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো একের পর এক। ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. মহামারিতে আক্রান্ত হলেন এবং মুয়াবিয়া রা.কে স্থলাভিষিক্ত করে দামেস্কে চলে এলেন এবং দামেস্কেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

এবার মুয়াবিয়া রা. পুনরুদ্যমে কায়সারিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু কায়সারিয়া এক বাণিজ্যিক শহর। এ শহরে সাত লক্ষ বেতনভোগী সৈন্য বসবাস করে। এক লক্ষ সৈন্য প্রত্যহ রাতে প্রহরা দেয়। এ শহরকে পদানত করা কি চাট্টিখানি কথা?

রোমান সেনাপতির নেতৃত্বে যোদ্ধারা প্রত্যেহ শহরের বাইরে এসে আক্রমণ করে। পরাজিত হলেই শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। সর্বশেষ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বহু রোমান সৈন্য ও শহরবাসীকে হত্যা করল। ফলে শহরময় চরম ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। অন্ধকার চিরে এক ইহুদী গুটি গুটি পদক্ষেপে মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট উপস্থিত হলো। বললো, যদি আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনদের নিরাপত্তা দেয়া হল, তাহলে আমি এক গোপন পানি-পথের সন্ধান দিব। সে পথ দিয়ে আপনারা সহজে শহরে

পৌঁছতে পারবেন। তারপর সহজেই শহরের পতন ঘটবে।

মুয়াবিয়া রা. আবেদন মঞ্জুর করলেন। কয়েকজন বীর মুজাহিদ সেই ইহুদীর সাথে পানিপথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করে সিংহদ্বার খুলে দিল। আর অমনি মুয়াবিয়া রা. মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শহরে প্রবেশ করলেন।

রোমান সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতবুদ্ধি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। আত্মরক্ষার চিন্তায় বিভোর। ফলে মুজাহিদদের শানিত তরবারির আঘাতে এক লক্ষ রোমান সৈন্য নিহত হলো। এরপর গোটা সিরিয়া মুসলমানদের নিকট কণ্টকমুক্ত হয়ে গেল। বাধাহীন হয়ে গেল।

এ বিজয় সংবাদ শুনে উমর রা. আনন্দে উল্লসিত হয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়েছিলেন। আর মজলিসে উপস্থিত সবাই স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন।

দামেস্কের গভর্নর মুয়াবিয়া রা.

হিজরী ১৮ সালের কথা। গোটা সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো এক মহামারী। একের পর এক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো। চারদিকে ভয়। মৃত্যুর হাতছানি। সেনাপতি আবু উবায়দা রা. মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মুয়ায ইবনে জাবাল রা.। তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন। এভাবে মুজাহিদ বাহিনীর অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। প্রায় পঁচিশ হাজার মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করলেন।

হাজার হাজার শিশু এতীম হলো। হাজার হাজার নারী বিধবা হলো। নিহতদের ধন-সম্পদ হিফাজতের মানুষও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হলো।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. এ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ছুটে এলেন দামেস্কে। সিরিয়ার প্রত্যেকটি শহরে দু'চার দিন করে অবস্থান করলেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদদের বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন। সীমান্ত জুড়ে সেনা ছাউনী তৈরির নির্দেশ দিলেন। নিহতদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। শূন্য পদগুলোতে নতুন লোক নিয়োগ করলেন এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.কে দামেস্কের গভর্নর নিয়োগ করলেন।

শহীদ হলেন খলীফা উমর রা.

হিজরী তেইশ সালের কথা। উমর রা. পাপিষ্ঠ ইবনে মুলজিমের আঘাতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন উসমান রা.। মুয়াবিয়া রা.-এর যোগ্যতা, জ্ঞান-গরিমা, গভীর প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বীরত্বের সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। তিনি মুয়াবিয়া রা.কে গোটা শামের গভর্নর নিয়োগ করলেন এবং রোমানরা যেন কখনও চোখ তুলে তাকাতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

তারাবুলুশ্ শামে আক্রমণ

রোমানরা প্রায়ই সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ করে। আচমকা প্রবেশ করে লুটতরাজ করে। সুযোগ পেলে সেনা ছাউনীতে আক্রমণ করে মুজাহিদদের হত্যা করে পালিয়ে যায়। রোমানদের এই উৎপাত দমন করতে ইচ্ছে করলেন মুয়াবিয়া রা.।

সুফিয়ান ইবনে মুজীব আয্দী রা. এক নামকরা যোদ্ধা। তাঁকে পাঠালেন সীমান্ত শহর তারাবুলুশ্ শাম আক্রমণ করতে। মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন সুফিয়ান ইবনে মুজীব রা.। দেখলেন, শহরটি অত্যন্ত মজবুত। প্রায় অপরাজেয়। একে পদানত করতে হলে দীর্ঘদিন জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি অদূরে একটি দূর্গ নির্মাণ করলেন। জল ও স্থলের সকল পথ বন্ধ করে দিলেন।

মুজাহিদ বাহিনী দিনে আক্রমণ করে রাতে দুর্গে বিশ্রাম করে। এভাবে কিছুদিন যুদ্ধ চলতে থাকল। ফলে অবরুদ্ধ রোমানরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রোম সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলো।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের রক্ষার জন্য রাতের অন্ধকারে জাহাজ প্রেরণ করলো। সে জাহাজে করে তারা চুপিসারে পালিয়ে গেল।

পরদিন সকালে সুফিয়ান ইবনে মুজীব আয্দী রা. গিয়ে দেখেন দুর্গ ফাঁকা। কোথাও জনমানুষের কোন চিহ্ন নেই। বিনা যুদ্ধে তিনি শহর দখল করে নিলেন ও মুয়াবিয়া রা.কে তাঁর বিজয় সংবাদ জ্ঞাপন করলেন।

উমুরিয়া অভিযান

শামের একেবারে সীমান্ত এলাকা উমুরিয়া। অত্যন্ত পুরাতন এক শহর। এখানে রোমানদের এক মজবুত কিল্লা বিদ্যমান। বহু সৈন্য এখানে বাস করে। শামের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এ শহর পদানত করা অতীব প্রয়োজন।

২৫ হিজরীতে মুয়াবিয়া রা. উমুরিয়া অভিযানে বের হলেন। উমুরিয়া যাওয়ার পথে তিনি ইন্তাকিয়া থেকে তুরতুস পর্যন্ত রোমানদের অনেক দুর্গ খালি পড়ে থাকতে দেখলেন।

তিনি শাম, জাযিরা ও কিন্নসিরীন থেকে মুসলমানদের এনে এসব দুর্গে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর দামেস্কে ফিরে এলেন।

এর দু'বছর পর তিনি সেনাপতি ইয়াযিদ ইবনে হুরকে উমুরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি শামের সীমান্তে অবস্থিত রোমানদের অনেকগুলো দুর্গ দখল করে ধ্বংস করে দেন এবং উমুরিয়া পদানত করতে না পেরে ফিরে আসেন।

শামশাত আক্রমণ

খলীফাতুল মুসলিমীন উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-এর পত্র এলো। তিনি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত শামশাত নগরী আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন।

মুয়াবিয়া রা. নির্দেশ পেয়ে বিশিষ্ট রণবিদ হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী ও সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সুলামী রা.কে সাথে নিয়ে শামশাতের পথে বেরিয়ে পড়লেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা ছুটে চললেন। শামশাতের অধিবাসীরা মুজাহিদ বাহিনী দেখেই ভয়ে চুপসে গেল। হৃদয় তাদের দুরুদুরু করে কাঁপতে লাগল। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে প্রতিনিধি দল পাঠালো। ফলে সন্ধির মাধ্যমে শামশাত শহর পদানত হলো।

বিজয়ের পর মুয়াবিয়া রা. সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রা.কে সেখানের গভর্নর নিযুক্ত করে দামেস্কে ফিরে এলেন।

এভাবে জিহাদের ধারা অব্যাহত রেখে মুয়াবিয়া রা. মালাতিয়া, সাইপ্রাস, রোডসসহ বহু শহর দখল করে ইসলামী খিলাফতের সীমানা বহু দূর পর্যন্ত

বিস্তৃত করেন। সর্বত্র ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি যোগ্যতা, দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও প্রজ্ঞাবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করেন।

জুবাইর ইবনে নুফাইর রা. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁটছিলেন। তাঁর সাথে একদল সাহাবী। কথা প্রসঙ্গে তাঁরা শামের আলোচনা করছিলেন।

তখন জনৈক সাহাবী বললেন, আমরা কিভাবে শাম পদানত করবো! অথচ সেখানে রয়েছে রোমানদের দুর্ধর্ষ বাহিনী।

জুবাইর ইবনে নুফাইর রা. বলেন, সাহাবীদের মাঝে তখন মুয়াবিয়া রা. ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি ছড়ি ছিল। রাসূল তা দ্বারা মুয়াবিয়া রা.-এর কাঁধে আঘাত করে বললেন, তোমাদের পক্ষ থেকে মুয়াবিয়াই তার জন্য যথেষ্ট হবে।[১]

বিস্ময় ও প্রতিবাদ

উমর ইবনে খাত্তাব রা. তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। চারদিকে সদা সতর্ক তাঁর দৃষ্টি। অত্যন্ত প্রখর ও তীক্ষ্ণ তাঁর মেধা। ঈমানী প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার আলো ফেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে গড়া সাহাবীদের মধ্য থেকে বেছে বেছে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর রাখেন। বিন্দু পরিমাণ গাফলতি বা অসতর্কতা দেখলেই বরখাস্ত করে আরেকজনকে নিযুক্ত করেন।

আবু হুরায়রা রা.-এর মত মহান সাহাবীও উমর রা.-এর সতর্কতার হাত থেকে রেহাই পাননি। একদা উমর রা. আবু হুরায়রা রা.কে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করলেন। অত্যন্ত সুনামের সাথে আবু হুরায়রা রা. বাহরাইনের শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। ইতোমধ্যে বৈধ উপায়ে বেশ কিছু সম্পদের মালিক হলেন। হযরত উমর রা.-এর নিকট তা অজ্ঞাত রইলো না। তিনি তা শুনলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। আবু হুরায়রা রা. মদীনায় এলে তাঁকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায়

---

[১]. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪

বললেন, হে আল্লাহ ও আল্লাহর কিতাবের দুশমন! তুই কি আল্লাহর সম্পদ চুরি করছিস?

বিস্ময়ে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো আবু হুরায়রা রা.-এর মাথায়। আকাশ কুসুম চিন্তা করেও তিনি তাঁর ক্রোধের কারণ খুঁজে পেলেন না। শীতল কণ্ঠে বললেন, আমি আল্লাহর দুশমন নই। তাঁর কিতাবেরও দুশমন নই। বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের দুশমনের দুশমন আর আমি তো আল্লাহর সম্পদ চুরি করিনি।

উমর রা.-এর কণ্ঠ এবার আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। বললেন, আচ্ছা, তাহলে তুমি দশ হাজার দিনার পেলে কোথা থেকে?

এতক্ষণে আবু হুরায়রা রা. ক্রোধের কারণ অনুধাবন করতে পারলেন। নিস্তেজ অথচ জোরালো কণ্ঠে বললেন, আমার ঘোড়া বাচ্চা দিয়েছে আর কিছু উপঢৌকন জমা হয়েছে। এগুলো তারই অর্থ। উমর রা.-এর কণ্ঠ যেন আরও তেজোদীপ্ত। বললেন, যাও! ঐ সম্পদ বাইতুল মালে জমা দিয়ে দাও।

আবু হুরায়রা রা. কোন প্রতিবাদ করলেন না। কোন চ্যালেঞ্জও করলেন না। নীরবে সমুদয় সম্পদ এনে বাইতুল মালে জমা দিলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাবকে ক্ষমা করে দাও।

বিষয়টি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। উমর রা. তত্ত্ব তালাশ শুরু করলেন। খোঁজ খবর নিয়ে বুঝলেন, আবু হুরায়রা নির্দোষী। সত্যবাদী। এরপর উমর রা. পুনরায় তাঁকে প্রশাসক নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু আবু হুরায়রা রা. অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রশাসন থেকে দূরে রইলেন।[২]

ইনি হলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.। এ হলো তাঁর কঠোরতা আর সতর্কতা। সেই উমর ইবনে খাত্তাব রা. যখন সিরিয়ার প্রশাসক উমাইর ইবনে সাআদ রা.কে বরখাস্ত করে তাঁর স্থানে মুয়াবিয়া রা.কে নিযুক্ত করলেন, তখন মদীনার অনেকেই এ কাজটি পছন্দ করলো না। অনেকে সমালোচনা করলো। কেউ কেউ বললো−

---

২. ছায়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা− আবু হুরাইরা রা.-এর জীবনী দ্রষ্টব্য

عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلّٰى مُعَاوِيَةَ

এ কেমন কথা! উমাইরকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থানে মুয়াবিয়া রা.কে নিযুক্ত করলেন। না, এটা ঠিক হয়নি। আবার কেউ বললো–

وَلّٰى حَدِيْثَ السِّنِ

আশ্চর্য! অল্প বয়সের যুবককে প্রশাসক বানালেন?

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর কানে সব কথাই পৌঁছল। তাই একদিন তিনি মদীনায় সমবেত লোকদের মাঝে প্রতিবাদী কণ্ঠে বললেন–

تَلُوْمُوْنِىْ فِىْ وِلَايَتِهٖ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَّاهْدِبِهٖ

শোন, হে মদীনার লোকেরা! আমি মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করেছি। তাই তোমরা আমাকে তিরস্কার করছো। শোন, শোন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আপনি তাকে হিদায়াতদানকারী বানিয়ে দিন। আর তার মাধ্যমে মানুষের হিদায়াতের ফায়সালা করুন।[১]

এভাবে অনেকের মতামতকে উপেক্ষা করে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনে খাত্তাব রা. মুয়াবিয়া রা.কে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

এরপর দেখা গেল, সত্যিই মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত সুনামের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করলেন। উমর রা.-এর নিকট তিনি কখনও অভিযুক্ত হননি। স্বীয় পদ থেকে কখনও বরখাস্ত হননি। আর উসমান রা. খলীফা হলে তাঁকে গোটা শামের শাসক নিযুক্ত করলেন। অত্যন্ত সুনামের সাথে তিনি তা শাসক করেছিলেন।

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৫

নির্মল কৌতুকপ্রিয় হযরত মুয়াবিয়া রা.

মুয়াবিয়া রা.-এর স্বভাব স্নিগ্ধ কোমল। নির্ভয়ে সবাই তাঁর সাথে অকপটে কথা বলতে পারতো। সাহায্য সহযোগিতার আবেদন পেশ করতে পারতো। অভাব অভিযোগ উপস্থাপিত করতে পারতো।

এক দিনের ঘটনা। এক স্বপ্নবিলাসী মানুষ মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট এলো। আবদার জুড়ে বললো, আমি একটি বাড়ি বানাচ্ছি। আমাকে কিছু সাহায্য করুন। আপাতত বার হাজার কাঠের খুঁটির প্রয়োজন। তার ব্যবস্থা করে দিন।

মুয়াবিয়া রা. বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়?

লোকটি বললো, বসরায়।

মুয়াবিয়া রা. বললেন, আচ্ছা, তোমার বাড়িটি কত বড় হবে?

লোকটি বললো, দৈর্ঘ ও প্রস্তে দু'মাইল করে হবে।

মুয়াবিয়া রা. তখন স্মিত হেসে বললেন, আচ্ছা, তাহলে তুমি এ কথা বলো না যে, তোমার বাড়ি বসরায়। বরং বলো, বসরা শহরটি তোমার বাড়িতে অবস্থিত।[২]

মুয়াবিয়া রা.-এর এ নির্মল কৌতুকপূর্ণ কথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে ফেলল।

আমর ইবনে আস রা.-এর সাথে মুয়াবিয়া রা.-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সর্বজন জ্ঞাত। সংকটময় মুহূর্তগুলোতে আমর ইবনে আস রা. জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। ফলে তাঁদের মাঝে ছিল গভীর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ। প্রায়ই তাদের মাঝে নির্মল হাস্যরসিকতাও হতো।

এক দিনের ঘটনা। আমর ইবনে আস রা. মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট এলেন। দেখলেন, মুয়াবিয়া রা. একটি পত্র পাঠ করছেন। আমর ইবনে আস রা. আসন গ্রহণ করলেন। সে পত্রে একজন সাহাবীর ইন্তেকালের সংবাদ ছিল। মুয়াবিয়া রা. তা পাঠ করে দারুণ ব্যথিত হলেন। কান্না বিজড়িত

---

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪৩

কণ্ঠে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। আমর ইবনে আস রা. বিষয়টি সহজেই আঁচ করে ফেললেন। সাথে সাথে তাঁর রসিক মন একটি চমৎকার ছন্দ তৈরি করলো। তিনি আবৃত্তি করলেন–

تَمُوْتُ الصَّالِحُوْنَ وَأَنْتَ حَيٌّ   تَخَطَّأَكَ الْمُنَايَا وَأَنْتَ لَاتَمُوْتُ

সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা একের পর এক মৃত্যুবরণ করছে। অথচ তুমি এখনও জীবিত। মৃত্যু তোমার ব্যাপারে ভুল করছে। তাই তুমি মৃত্যুবরণ কর না।

মুয়াবিয়া রা. ছিলেন স্বভাব-কবি। আমর ইবনে আস রা.-এর এ ছন্দ শুনে তিনিও বিলম্ব করলেন না। সাথে সাথে প্রতি উত্তরে একটি ছন্দ তৈরি করে আবৃত্তি করলেন–

اَتَرْجُوْ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنْتَ حَىٌّ   فَلَسْتُ بِمَيِّتٍ حَتّٰى تَمُوْتَ

আপনি কি চান যে, আমি মৃত্যুবরণ করবো আর আপনি বেঁচে থাকবেন। আপনি মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আমি মৃত্যুবরণ করবো না।[১]

এ ধরনের নির্মল কৌতুক ও হাস্যরসিকতার অনেক কাহিনী মুয়াবিয়া রা.-এর জীবন কাহিনীর সাথে ওতপ্রোতভাবে মিলে আছে, যা পাঠ করলে সত্যিই পাঠক বিস্মিত হয়। শুনলে শ্রোতা হতবাক হয়। হতবুদ্ধি হয়।

এক মায়ের আকুতি

একদা আমীরুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট কয়েকজন চোরকে ধরে আনা হলো। তিনি তাদের অপরাধের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেন। অভিযোগের সত্যতা নিখুঁতভাবে যাচাই করলেন। তারপর ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

একের পর এক সব চোরেরই হাত কেটে ফেলা হলো। আর মাত্র একজন

---

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪১

বাকি। সেই চোরটি তখন একটি বিস্ময়কর কাণ্ড করে বসলো। হৃদয়বিদারক কান্না বিজড়িত কণ্ঠে একটি কবিতা আবৃত্তি করলো।

يَمِيْنِيْ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أُعِيْذُهَا
بِعَفْوِكَ أَن تَلْقي مَكَانًا يُشِيْنُهَا
يَدِىْ كَانَتِ الْحَسَنَاءُ لَوْ تَمَّ سِتْرُهَا
وَلَا تَعْدَمُ الْحَسَنَاءُ عَيْبًا يُشِيْنُهَا
فَلَا خَيْرَ فِى الدُّنْيَا وَكَانَتْ حَبِيْبَهُ
إِذَا مَا شِمَالِيْ فَارَقَتْهَا يَمِيْنَهَا

হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আমার ডান হাতকে কলঙ্কময় অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য আপনার ক্ষমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। যদি আমার হাত পরিপূর্ণ থাকে তবেই না সৌন্দর্যময় হবে। আর সুন্দর হাতে তো এমন দোষ থাকে না যা তার সৌন্দর্যের ক্ষতি করে। দুনিয়া আমার নিকট প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে কোনই কল্যাণ নেই, যদি আমার বাম হাত তার ডান হাতকে হারিয়ে ফেলে।

চোরের কান্না বিজড়িত হৃদয়বিদারক আবৃত্তির আবেশে মুয়াবিয়া রা. থমকে দাঁড়ালেন। হৃদয় তাঁর দোদুল্যমান। মন তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করবেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। তাছাড়া অন্যান্য চোরদের তো হাত কাটা হয়ে গেছে। তাই তারও হাত কাটতে হবে। একই অপরাধের অপরাধীদের একজনকে ক্ষমা করা আর অন্যদের শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। উচিত নয়।

কিন্তু কবিতার মর্ম মুয়াবিয়া রা.-এর চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাকিয়েও যেন তাকাতে পারছেন না। ভাবনার দোলায় দোল খেতে খেতে অবশেষে বললেন, তোমার সাথীদের হাত কেটে ফেলার পর এখন তোমার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

অদূরে দাঁড়িয়ে আছে চোরের মা। হৃদয়ে কান্নার উর্মিমালা তোলপাড় সৃষ্টি

করলেও মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছিল না। মুয়াবিয়া রা.-এর কথা শুনে চোরের মায়ের অন্তরে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ভাবল, হয়তো ছেলের হাতকে রক্ষা করা যেতে পারে। তাই দেরি করলো না। এগিয়ে এসে বিনীতকণ্ঠে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! যে পাপরাশি থেকে আপনি আল্লাহর নিকট সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন তার সাথে আমার এই ছেলের হাত না কাটার পাপকে মিলিয়ে নিন। আর তাকে ক্ষমা করে দিন।

অসহায়া মায়ের হৃদয়ের আকুতি ও অন্তরের আবেগে মুয়াবিয়া রা. অভিভূত হলেন। হতবাক হলেন। ফলে উতলা হয়ে উঠলো তাঁর মন। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। মাতৃহৃদয়ের আকুতির দিকে তাকিয়ে চোরের হাত কাটা স্থগিত করলেন। চোরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং এ পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।[১]

এরপর চোরের মা মুয়াবিয়া রা.-এর জন্য দুআ করতে করতে তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল।

খেলাফতের দিনগুলো

পঁয়ত্রিশ হিজরীর আঠারই জিলহজ্জ। রোজ শুক্রবার। এ দিনে তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফ্ফান রা. অত্যন্ত নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর বাসভবনে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করা হলো। তাঁর বাসভবন লুণ্ঠিত হলো।

চমকে উঠল মুসলিম জাহান। চারদিকে ভয়। চারদিকে আতঙ্ক। সবাই হতবুদ্ধি। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কখন কী ঘটবে কেউ বলতে পারছে না। যে-ই শাহাদাতের সংবাদ শুনল নীরবে অশ্রু ফেলল। বিদ্রোহীদের অভিশাপের পর অভিশাপ দিল। শহীদ খলীফার জন্য দুআ করলো। অবশেষে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আলী ইবনে আবু তালেব রা.। তিনি সবাইকে ঐক্যের আহ্বান জানালেন। খেলাফতের প্রাথমিক কাঠামোকে মজবুত করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু তা হলো না।

বিদ্রোহীদের বিচারের দাবী নিয়ে মুসলিম উম্মাহ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো।

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৯

শুরু হলো অভ্যন্তরীণ বিবাদ। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। সংঘটিত হলো উষ্ট্র যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ। এ যুদ্ধদ্বয়ে বহু সাহাবী শাহাদত বরণ করলেন। তাদের এ যুদ্ধ ক্ষমতার স্বার্থ নিয়ে হয়নি। ব্যক্তি স্বার্থেও হয়নি। দুনিয়ার কোন লক্ষ্যে হয়নি। ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে, আল্লাহর বিধান দুনিয়াতে বাস্তবায়িত করার জন্য হয়েছে। তবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। তাই উভয় পক্ষের যোদ্ধারা ছিলেন সত্যে অবিচল। নিহতরা হয়েছিলেন শহীদ। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছিলেন।

এ ভয়াবহ বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর হোতা কোন্ পাপীষ্ঠ নরাধম? তা কি বলতে পার? সে হলো এক ধুরন্ধর ধড়িবাজ ইহুদী নেতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। এ নরাধম উসমান রা.-এর খেলাফতকালে মুসলমানের বেশ ধরে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তির বিষ ছড়িয়ে, মিথ্যা অবাস্তব কথা রটিয়ে তাদের উত্তেজিত ও মারমুখী করে তোলে। ফলে উসমান রা. শাহাদাত বরণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম বারবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাবাই চক্রের নীল ষড়যন্ত্রে তা সম্ভব হয়নি। তাই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং জিহাদের ধারাবাহিকতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

৪০ হিজরীতে মুয়াবিয়া রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবার জিহাদের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। সর্বপ্রথম তিনি মুসলিম সমাজে লুকায়িত আত্মঘাতী শক্তি সাবাই চক্রের বিভ্রান্ত দল খারেজীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান।

৪১ হিজরীতে বালখ ও হিরাতে কাবুরের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তারপর তাঁর নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী বুসত হতে তুখারিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়। সিজিস্তান হতে গযনী পর্যন্ত গোটা অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। আমীরুল মুসলিমীন হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর নির্দেশে খুরাসানের গভর্নর সাঈদ ইবনে উসমান রা. আমু দরিয়া অতিক্রম করে তুর্কিস্থান পদানত করেন। মাকরান এবং কান্দাহারও এ সময়েই বিজিত হয়।[২]

---

[২]. ফতহুল বুলদান, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৪১০-৪১১, ৪৩৬, ৪৪১, ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৯/৪১৭

মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনকালে রোমানদের সাথে অনেক যুদ্ধ হয়। ৪৪ ও ৪৯ হিজরীতে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধ রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। এসব যুদ্ধের মাঝে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ সর্বাধিক খ্যাত ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কনস্টান্টিনোপল পূর্ব ইউরোপের কেন্দ্র বিন্দু। মুজাহিদ বাহিনী তা অবরোধ করলে গোটা পূর্ব ইউরোপে আরবদের ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

৪৯ হিজরীতে মুয়াবিয়া রা. তাঁর ছেলে ইয়াযিদ-এর নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত বাহিনী কনস্টান্টিনোপলে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে যোগদান করেন আবু আইয়ুব আনসারী রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., ও আরও অনেক উঁচু পর্যায়ের সাহাবী রা.। যুদ্ধ চলাকালে আবু আইয়ুব আনসারী রা. ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্তিম বাসনা অনুযায়ী তাঁকে কনস্টান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের দাফন করা হয়।[১]

৫৩ হিজরীতে মুজাহিদ বাহিনী রোড্স আক্রমণ করে। রোড্স খুবই উর্বর সবুজ শ্যামল এক চিত্তাকর্ষী দ্বীপ। রোম সাগরের উপদ্বীপ আনাতোলীর নিকট অবস্থিত। রোড্স পদানত করে সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করা হয়। রোড্সের পর মুজাহিদ বাহিনী সিসিলি আক্রমণ করে। কিন্তু তখন তা পদানত করা সম্ভব হয়নি।[২]

মুয়াবিয়া রা. ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, সফল রাজনীতিবিদ ও যোগ্য শাসক। তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন আমর ইবনুল আস রা., মুগীরা ইবনে শুবা রা., জিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এবং আরও অনেক প্রতিভাবান, যোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও যোদ্ধা।

তিনি শাসক ও গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তা ছাড়া সর্বদা তাদের কাজকর্ম ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। নখদর্পণে রাখতেন। যাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সময়ানুবর্তী, নিয়মানুবর্তী, প্রখর বুদ্ধিমান ও স্বভাবগতভাবে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী, তিনি শুধু তাদেরকেই তাঁর পরামর্শদাতা ও সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করতেন।

---

[১]. তবকাতে ইবনে সাআদাত

[২]. ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৯/৪১৭

মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সকল কেন্দ্রে তিনি কিল্লা ও সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া বেশ কিছু স্বতন্ত্র শহরও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম নৌবাহিনীকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌছান। মিসর ও সিরিয়া উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর খেলাফতকালে যতগুলো নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয় তার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী যুগেও পাওয়া যায় নি।[৩]

মুয়াবিয়া রা. জনকল্যাণমূলক বহু কাজ করেন। কৃষিকাজ ও চাষাবাদের উন্নতির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিদান করেন। সেচ কার্যের সুবিধার্থে স্থানে স্থানে খাল খনন করেন। ফলে তাঁর খেলাফতকালে শস্য উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস পায় এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দূর হয়ে যায়।

সিরিয়ার প্রাচীন শহর মারআশ। তার ছিল নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কিন্তু কালের বিবর্তনে বিরান হয়ে গিয়েছিল। তিনি তা পুনরায় আবাদ করে সেখানে জনবসতি স্থাপন করেন। উকবা ইবনে নাফে রা. আফ্রিকায় কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে বারবার জাতির বিদ্রোহ ও মুরতাদ হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তিনি হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪]

আমীরুল মুসলিমীন হযরত মুয়াবিয়া রা. উম্মুল মুমিনীনদের খেদমত করাকে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করতেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর খেদমত করতে একটুও ত্রুটি করতেন না। কখনও কখনও এক সাথে পাঁচ হাজার, দশ হাজার দিরহাম তাঁর খেদমতে পাঠাতেন। শত্রু-মিত্র সবাইকে তিনি প্রচুর আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা., আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা. ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেব-এর বংশধরের অনেকেই তাঁর ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। তাদের কড়া কথায় একটুও

---

[৩]. ফতহুল বুলদান (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২৩৬, ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৯/৪১৭
[৪]. ফতহুল বুলদান (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১৯/২৩৬, ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৯/৪১৮

ক্রুদ্ধ হতেন না। রাগ করতেন না। বরং প্রত্যেককেই বিপুল পরিমাণে অর্থ, ভাতা ও উপঢৌকন প্রদান করতেন।[১]

মুয়াবিয়া রা. ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁর অন্তরে অহংকারের লেশ ছিল না। আবু মিজলায রহ. বলেন, মুয়াবিয়া রা. একবার এক মজলিসে গেলেন। মজলিসের লোকেরা তাঁকে দেখেই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেল। মুয়াবিয়া রা. তা পছন্দ করলেন না। তিনি এর প্রতিবাদ করে বললেন, তোমরা এরূপ করো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ   যে চায় মানুষ তার সামনে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে তাহলে সে জাহান্নামে তার নিবাস বানিয়ে নিক।[২]

তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাতের অবশিষ্ট খাবার দিয়ে সকালে নাশতা করতেন। স্বভাবগতভাবে তিনি দুনিয়াবিমুখ ও আবেদ ছিলেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিল সাধারণ। ইউনুস ইবনে মায়সারা রহ. বলেন, আমি মুয়াবিয়া রা.কে দামেস্কের বাজারে দেখলাম। তার বাহনের পশ্চাতে তার গোলাম বসে আছে, আর তিনি একটি তালি দেয়া জামা গায়ে দিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরছেন।[৩]

আবু হামলা রহ. বলেন, আমি একবার দামেস্কের মসজিদে গেলাম। গিয়ে দেখি মুয়াবিয়া রা. মিম্বারে বসে খুতবা পাঠ করছেন। আর তার গায়ের জামাটি তালি দেয়া।[৪]

সর্বদা পাপ ও পুণ্যের চিন্তায় বিভোর থাকা ছিল মুয়াবিয়া রা.-এর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের প্রত্যেক কাজেই যেন তিনি পুণ্য অর্জন করতে পারেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন, এ কথা হৃদয়ে সর্বদা

---

১. সিয়ারুস সাহাবা   ১৪২, ইসলামী বিশ্বকোষ   ৪২১

২. হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখী হাকায়েক : ২৬১, ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৯/৪২১, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৯

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৭, আল আওয়াসম মিনল কাওয়ামিস : ২০৯

৪. আল আওয়াসিম মিনাল কাওযাসিম : ২০৯, আমীরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া রা. : ৫৮

জাগরুক রাখার জন্য তিনি এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেন। তিনি তার আংটিতে লিখে নিলেন لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ প্রত্যেক আমলের বিনিময়ে পুণ্য রয়েছে। এ আংটি দ্বারাই তিনি খেলাফতের সকল ফরমানে মোহর লাগাতেন।[৫]

তবে সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালে সীমান্তবর্তী কাফেরদের মাঝে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বাহ্যিক জৌলুস ও আড়ম্বরতা অবলম্বন করেছিলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন উমর রা.-এর নিকট এ অভিযোগ উত্থাপিত হলে মুয়াবিয়া রা. উত্তরে এ কথাই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছিলেন। আর উমর রা. তা শুনে আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, এ জন্যই তো আমরা তার উপর নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করেছি। উমর রা. তাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে 'আরবের কিসরা' বলে অভিহিত করতেন।[৬]

একদা রোমানদের সাথে সামরিক সন্ধি চুক্তি হলো। ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে শান্তির সমীরণ বয়ে চললো। কিন্তু চুক্তির সময় শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হলে তিনি একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। তার ইচ্ছে, সীমান্তে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধির সময় শেষ হয়ে যাবে। আর সাথে সাথে আক্রমণ করলে অতি সহজে শত্রুদের পরাজিত করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদানত করা সম্ভব হবে।

তাই হলো, সন্ধির সময় উত্তীর্ণ হতে না না হতেই মুয়াবিয়া রা. আক্রমণ করে বসলেন। অঞ্চলের পর অঞ্চল পদানত করতে করতে সামনে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ পেছন দিক হতে তাকবীরের আওয়াজ এলো। কে যেন উচ্চকণ্ঠে বলছে– اَللّٰهُ أَكْبَرُ...وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ – আল্লাহ সবচে' বড়। মুমিনের চরিত্র ওয়াদা পূরণ করা, ওয়াদা খেলাফ করা নয়।

মুয়াবিয়া রা. পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, একজন অশ্বারোহী। তীর তীব্র গতিতে ধূলিঝড় উড়িয়ে ছুটে আসছে। তিনি চলার গতি মন্থর করলেন। দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী আমর ইবনে আবাসা রা. ছুটে আসছেন। মুয়াবিয়া রা.-এর অন্তর

---

[৫]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৪

[৬]. আল ইসতিয়াব : ৩/১৪১৭, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৭

অজানা আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। কাছে এলে হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? ব্যাপার কী?

আমর ইবনে আবাসা রা.-এর কণ্ঠে উদ্বেগ। বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– যদি কোন জাতির সাথে সন্ধি থাকে, তাহলে সন্ধির সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঘোষণা ছাড়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে না।

মুয়াবিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে সাথে সাথে শির অবনমিত করে নিলেন এবং মুজাহিদ বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। ফলে বিজিত অঞ্চল পেছনে ফেলে মুসলিম বাহিনী ফিরে এলো।[১]

আরেক দিনের ঘটনা। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. তখন ইসলামী বিশ্বের একচ্ছত্র খলীফা। তিনি তখন বিশ্বের একমাত্র পরাক্রমশালী শক্তিধর শাসক। তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় তখন পৃথিবী থরথর করে কাঁপে।

তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন জাবালা ইবনে সাহীম রহ.। তাঁর কামরায় প্রবেশ করে এক বিস্ময়কর কাণ্ড দেখলেন। এতে একেবারে থ খেয়ে গেলেন। দেখলেন, বিশ্বের একমাত্র শক্তিধর শাসক খলীফা মুয়াবিয়া রা.-এর গলায় একটি দড়ি। আর একজন শিশু তা ধরে তাঁকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

জাবাল ইবনে সাহীম রহ. বলেন, আমি তখন বিস্ময়ের প্রান্ত সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখ দুটি ছানাবড়া। আপত্তি ও অভিযোগের জোরালো ভাষা আমার কণ্ঠে। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এটা কী করেছেন?

মুয়াবিয়া রা. বললেন, হে নির্বোধ! চুপ কর। আমি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ

---

১. মিশকাতুল মাসবীহ : ৩৪৭

কারো ছোট শিশু থাকলে সে যেন তার মনোরঞ্জন করে।[২]

এভাবে জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। মেহনত মুজাহাদা করতেন।

পরপারের পথে মুয়াবিয়া রা.

হিজরী ৫৯ সালের কথা। মুয়াবিয়া রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমেই শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। ঔষধ পথ্য কোন কাজে আসছে না। তিনি অনুধাবন করলেন, জীবন সায়াহ্ন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। পরপারের আহ্বান তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাই তিনি একদিন সমবেত লোকদের মাঝে বক্তৃতা দিলেন। বললেন, বন্ধুগণ! আমি ঐ শস্য ক্ষেতের ন্যায় যার কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের উপর এত দীর্ঘদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেছি যে, আমি বিরক্ত-নিস্পৃহ হয়ে গেছি। মনে হয়, তোমাদের অবস্থাও তাই। এখন আমি তোমাদের থেকে বিদায় নিতে চাই। তোমরাও হয়তো তা কামনা করবে।

আমার পরে যারা শাসক হবে তারা আমার চেয়ে ভাল হবে না। যেমন আমি আমার পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভাল ছিলাম না। যে আল্লাহর সাথে মুলাকাতের তামান্না করে আল্লাহও তাঁর সাথে মুলাকাতের তামান্না করে। তাই বলছি, হে আল্লাহ! এখন আমি আপনার সাথে মুলাকাতের তামান্না করছি। আমাকে আপনার রহমতের কোলে তুলে নিন। আমার মুলাকাতে বরকত দান করুন।[৩]

মুয়াবিয়া রা.-এর বয়স তখন আটাত্তর বছর। বার্ধক্যে জরাজীর্ণ। এ দুআ করার পর দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগলো। প্রাণ-প্রাচুর্য হ্রাস পেতে লাগলো। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে সময় কাটতে লাগলেন।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন, কিছু মানুষ তাঁর সম্পর্কে অমূলক কথা বলছে। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি তখন চোখে সুরমা লাগালেন। তেল ব্যবহার করলেন। তারপর হেলান দিয়ে বসলেন ও লোকদের সাথে

---

২. তারিখুল খুলাফা : ২০২

৩. আল কামিল ফিত্ তারীখ : ৩/২৫৯, সিয়ারুস সাহাবা : ৭৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২৯১

সাক্ষাত দিলেন। যারা দেখে গেল তারাই বললো, মুয়াবিয়াকে তো বেশ সুস্থ দেখছি। এরপর সবাই সতর্ক হয়ে গেল। বিভ্রান্তিমূলক কথা বলা ছেড়ে দিল। তখন তিনি অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে একটি ছন্দ আবৃতি করলেন।

تَجَلُّدًا لِلشَّامِتِيْنَ أُرِيْهِمُ إِنِّيْ لِرَيْبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ

إِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا   أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

আমি ধৈর্য ধারণ করি তিরস্কারকারীদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার সামনে। আমি তাদের দেখাই যে, আমি যুগের বিপর্যয়ে দুর্বল হইনি।

আর মৃত্যু যখন শরীরে তার নখর প্রবেশ করাবে, তখন দেখতে পাবে তাবীজ কবজ কোন উপকার করে না।[১]

শরীরের অবস্থা আরও অবনতি হলে তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের ডেকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর একটি জামা উপহার দিয়েছিলেন। সেই জামাটি আমি আজকের দিনের জন্য অত্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক নখ আমার নিকট সঞ্চিত আছে। আমার মৃত্যুর পর রাসূলের দেয়া জামাটি দ্বারা আমার কাফন বানাবে এবং আমার মুখ ও চোখে তাঁর নখের টুকরাগুলো পুরে দিবে। হয়তো আল্লাহ এ ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।[২]

তারপর তিনি ইহজীবনের সর্বশেষ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে যোদ্ধা-জীবনের রণাঙ্গনের দৃঢ়তা ও তেজস্বীতা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন—

شُدِّ خِنَاقَ الرُّوْمِ

রোমের টুটি চেপে ধর।

এরপরই তিনি ইন্তেকাল করলেন। চির বিদায় নিয়ে পরকালের পথে যাত্রা

---

১ আল কামিল ফিত্ তারীখ : ৩/২৬০

২. আল ইসতিয়াব : ১/৩৬২

করলেন।

মুয়াবিয়া রা. ১৯ বছর ৩ মাস ২৭ দিন খেলাফত কার্য পরিচালনা করেন এবং ৬০ হিজরীর ১৫ রজব, বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন।

দাহহাকে ইবনে কায়স রা. তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন এবং দামেস্কের বাবুস সগীরে তাঁকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।[৩]

মুয়াবিয়া রা.-এর ইন্তেকালের বহু পরের ঘটনা। তখন ইসলামী বিশ্বের একচ্ছত্র খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান। ইতিহাসের পাতায় তার অনেক কীর্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। একদা তিনি বাবাসু সগীরের পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে বেশ কিছু গণ্যমান্য মানুষ। চলতে চলতে সহসা এক কবরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে দুআ করলেন। সমাধিস্থের জন্য মাগফিরাতের কামনা করলেন।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের এই কাণ্ড দেখে অনেকে হতবাক। বিস্মিত। জনৈক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে বললো, এটা কার কবর?

খলীফা আবদুল মালেক এ ধরনের প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মন তাঁর আবেগাপ্লুত হলো। হৃদয় তাঁর গলে গলে বিগলিত হলো। বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, এটা সেই মহান ব্যক্তির কবর যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে কথা বলতেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে থাকতেন। কাউকে বিপদাপদে সাহায্য সহযোগিতা করলে প্রচুর দান করতেন। একেবারে মুখাপেক্ষীহীন করে দিতেন। যদি কখনও শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন তখন তাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত স্থির হতেন না।

এটা আবু আবদুর রহমান মুয়াবিয়া রা-এর কবর।[৪]

মুয়াবিয়া রা.-এর রাত দিন

মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী ছিলেন। সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল মাসউদী তাঁর দৈনন্দিন কাজের একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন–

---

[৩]. উসদুল গাবা : ৪/৩৮৭, হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখী হাকায়েক : ২৬৫

[৪]. আল কামিল ফিত্ তারিখ : ৩/২৬৩

মুয়াবিয়া রা. ফজরের নামায আদায়ের পর খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রিপোর্ট শুনতেন। তারপর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াতের পর ঘরে চলে যেতেন এবং পারিবারিক প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিতেন। ইশরাকের নামায আদায় করে বাইরে আসতেন। বিশেষ বিশেষ লোকদের ডাকতেন এবং সারা দিনের জরুরি কাজসমূহের পরামর্শ করতেন। তারপর রাতের খাবারের বাকি অংশ দিয়ে নাস্তা করতেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। এরপর ঘরে চলে যেতেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসতেন এবং মসজিদ-সংলগ্ন কক্ষে উপবেশন করতেন। দুর্বল অসহায় লোকদের, বেদুইনদের, বালক, বালিকা, মহিলা নির্বিশেষে সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। সকলকে সন্তোষজনক উত্তর দিতেন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তাদের দুর্দশা লাঘব করতেন। সকলের অভিযোগ শ্রবণ করে হুকুম জারি করতেন। যখন আর কেউ বাকি থাকতো না তখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন। সেখানে বিশেষ বিশেষ সম্মানী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সাথে সাক্ষাত করতেন। তিনি তাদের অনুরোধ করতেন যেন যারা উপস্থিত নেই তাদের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করেন। তারা বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা বলতেন আর তিনি তা পূরণের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে দুপুর হয়ে যেত।

মুয়াবিয়া রা. দুপুরের খাবার খেতে বসলে তাঁর সচিব এসে উপস্থিত হতো। অদূরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের এক এক করে উপস্থিত করতেন এবং যেসব অভিযোগ ও কথা লিখে আনতেন তা পড়ে শোনাতেন। মুয়াবিয়া রা. আহার করতে করতে নির্দেশ নামা লিখাতেন। আগন্তুকরাও তাঁর সাথে আহারে শরীক হতো। তারপর তিনি গৃহে চলে যেতেন এবং যোহরের নামাযের জন্য আগমন করতেন।

যোহরের নামাযের পর খাস মজলিস বসতো। উপদেষ্টাদের সাথে মুসলিম জাহান সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ করতেন। পরামর্শ মুতাবেক নির্দেশ জারি করতেন। আসর পর্যন্ত এ মজলিস চলতো।

আসরের নামায আদায় করে ইশা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকতেন। ইশার পর গভর্নরদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতেন। এ আলোচনার পর ইলমী আলোচনা শুরু হতো। গভীর রাত পর্যন্ত ইলমী

আলোচনা চলতো।

মুয়াবিয়া রা. সর্বসাধারণের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ দুর্দশার কথা শ্রবণ করার জন্য দিনে পাঁচটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।[১]

মুয়াবিয়া রা. সারা দিন জনমানবের কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত থাকতেন। মুসলিম জাহানের হাজারো সমস্যার সমাধা তাকে করতে হতো। হাজারো ব্যস্ততার মাঝে হাজারো কাজের মাঝে যখনই নামাযের সময় পেতেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। কায়মনোবাক্যে নামায আদায় করতেন।

আবু দারদা রা. মুয়াবিয়া রা.-এর এই নিবিষ্ট মনের বিনয় বিগলিত নামায দেখে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন–

> ما رأيتُ أشبه صلاة برسولِ الله صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَم مِنْ أمِيركُم هٰذا
>
> তোমাদের এই আমীরকে ছাড়া আর কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যময় নামায আদায় করতে দেখিনি।[২]

সাবধান, হে নিন্দুক!

যুগে যুগে অনেক জ্ঞানপাপী, পাপিষ্ঠ নরাধম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই প্রিয় সাহাবীর সমালোচনায় বিভোর হয়েছে। উঠে পড়ে নিন্দায় মেতেছে। এ যুগেও তাদের অভাব নেই। তাদের কমতি নেই। সুতরাং সাবধান, হে নিন্দুক! তোমার হেদায়াতের জন্য, তোমার সুস্থ চিন্তা ও চেতনার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামের ও তাবেয়ীদের কিছু বাণী, কিছু প্রতিক্রিয়া ও তিনটি স্বপ্ন কাহিনী পত্রস্থ করা হলো। আশা করি তা তোমার হৃদয়ে সুস্থ চিন্তা ও চেতনা ফিরিয়ে আনতে, হেদায়াতের পথকে আলোকময় করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

---

[১] মুরুযুজ যাহাব : ৩/৩৬

[২]. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/২৭৫

বিখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীদের চোখে হযরত মুয়াবিয়া রা.

আমীরুল মুমিনীন উমর রা. উপস্থিত। সেই মজলিসে মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হলো। তখন উমর রা. অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, কুরাইশদের ঐ যুবক ও সরদারের পুত্রের কথা রেখে দাও, যে চরম রাগের মুখেও হাসতে পারে। স্বেচ্ছায় না দিলে যাঁর হাত থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে আনা অসম্ভব। যাঁর শিরস্ত্রাণ পেতে হলে পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তোমরা তারই সমালোচনা করছো?[১]

আরেক দিনের ঘটনা। আমীরুল মুমিনীন উমর রা. সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, 'হে লোক সকল! আমার অবর্তমানে তোমরা দলাদলি ও কোন্দল এড়িয়ে চলবে। যদি তা না কর তাহলে মনে রেখো, সিরিয়ায় মুয়াবিয়া আছে, সে তোমাদের শায়েস্তা করে দিবে।'[২]

সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা.। অনুসারীদের নানা কথা তাঁর কানে এলো। তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। বললেন– 'হে লোক সকল! তোমরা মুয়াবিয়ার শাসনকে অপছন্দ করো না। কারণ যেদিন তোমরা তাঁকে হারাবে সে দিন দেখবে, ধড় থেকে মুণ্ডগুলো কেটে কেটে পড়ছে।'[৩]

উমাইর ইবনে সা'আদ রা. দেখলেন, কিছু লোক মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে সমালোচনা করছে। তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, দেখো, মুয়াবিয়া সম্পর্কে উত্তম আলোচনাই শুধু করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ দুআ করতে শুনেছি– হে আল্লাহ! মুয়াবিয়ার মাধ্যমে তুমি লোকদের হেদায়াত দান কর।

সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. প্রায়ই বলতেন, উসমান রা.-এর পর মুয়াবিয়া রা.-এর চেয়ে উত্তম ন্যায় বিচারক আমার নজরে আর পড়েনি।[৪]

কবীসা ইবনে জাবের রা. বলেন, এ দু'চোখে আমি মুয়াবিয়া রা.-এর চেয়ে সহনশীল বিজ্ঞ ও নেতৃত্বের উপযুক্ত কাউকে দেখিনি।[৫]

---

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/১২৭

[২]. আল ইসাবা : ৪১৪, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩০

[৩] তারিখুল খুলাফা : ১৯৫, সিয়ার আলামিন নুবালা : ৪/২৮০

[৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/১৩৬

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/২৮৪

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবরাহীম ইবনে মায়সারা রহ. বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীযকে আমি কখনও কাউকে দোররা মারতে দেখিনি। তবে মুয়াবিয়া রা.-এর সমালোচনার অপরাধে এক ব্যক্তিকে দোররা মারতে দেখেছি।[৬]

জনৈক ব্যক্তি একদা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো কে উত্তম? মুয়াবিয়া, না উমর ইবনে আবদুল আযীয?

প্রশ্ন শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর মন উষ্ণ হয়ে উঠলো। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জেহাদে গিয়ে মুয়াবিয়া রা.-এর নাকের ছিদ্র পথে যে ধূলিবালি প্রবেশ করেছে তাও উমর ইবনে আবদুল আযীযের তুলনায় হাজার গুণ উত্তম।'[৭]

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তখন তিনি বললেন, শোন হে যুহরী! যে ব্যক্তি আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.কে মহব্বত করে মৃত্যুবরণ করলো আর সে দশজন সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার কথা সাক্ষী দেয় ও মুয়াবিয়া রা.-এর জন্য রহমতের দুআ করে, তাহলে আল্লাহর উপর দাবী হয়ে যায় যে, তিনি তার হিসাব নিকাশে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।[৮]

একদা মুয়াফা ইবনে ইমরান রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো, কে শ্রেষ্ঠ? মুয়াবিয়া না উমর ইবনে আবদুল আযীয? প্রশ্ন শুনে তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। তারপর বললেন, তুমি কি একজন সাহাবীকে একজন তাবেয়ীর মত মনে করছো? মুয়াবিয়া রা. তো তাঁর সাহাবী শ্যালক, কাতেবে ওহী এবং আল্লাহর ওহীর ব্যাপারে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীদের সমালোচনা করো না, যে ব্যক্তি তাদের গালমন্দ করবে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ রয়েছে।[৯]

---

[৬]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪২

[৭]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪২

[৮]. প্রাগুক্ত

[৯]. প্রাগুক্ত

আবু তওবা রবীয় ইবনে নাফে রহ. বলেন, মুয়াবিয়া রা. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের এক আবরণ। যদি কেউ এ আবরণকে উন্মোচিত করে তাহলে সে অন্যান্য সাহাবীদের ব্যাপারে অধিক দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।[১]

মাইমুনী রহ. বলেন, আমাকে একদা আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ডেকে বললেন, হে আবুল হাসান! যদি তুমি দেখ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তখন তুমি তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ কর।[২]

হত্যার নির্দেশ

জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাতে আমি গভীর ঘুমে অচেতন। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। গোটা দুনিয়া যেন ঘুমিয়ে আছে। ঠিক তখন আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তার চারপাশ ঘিরে বসে আছেন আবু বকর রা., উমর রা., আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা.।

তখন এক ব্যক্তি এসে সে মজলিসে উপস্থিত হলো। উমর রা. তাকে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে এই লোকটি আমাদের দুর্নাম করে বেড়ায়।

উমর রা. এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটু ধমক দিয়ে শাসালেন। লোকটি তখন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এদের কারও দুর্নাম করি না। তারপর মুয়াবিয়া রা.-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, আমি শুধু তার দুর্নাম করি।

লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন, তুই ধ্বংস হ, সে কি আমার সাহাবী নয়?! তিনবার এ কথা বললেন। এরপর একটি বর্শা হাতে নিলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.কে দিয়ে বললেন– جَابِهَا فى لَبَّتِهِ এর কণ্ঠনালীতে তা এঁটে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে মুয়াবিয়া রা. তাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করলেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

---

[১]. প্রাগুক্ত

[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪২

সেদিন ভোরে সব কাজের আগে আমি সেই লোকটির বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তার লাশ পড়ে আছে। তাকে যবাহ করা হয়েছে। হতভাগ্য সেই লোকটির নাম রাশেদ কিন্দী।[৩]

পাহাড়ের কন্দর থেকে

শাম। পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশ। প্রাচীন সভ্যতার দেশ। নয়নাভিরাম প্রকৃতি সৌন্দর্যের দেশ। এখানে সেখানে পাহাড়ের পর পাহাড়। সবুজ শ্যামল গাছে গাছে ভরা পাহাড়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে কলকল নির্ঝরমালা। সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে নিম্নভূমির সুবিস্তৃত বুকে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমি একদিন শামের এক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চারদিকে মনমাতানো পরিবেশ। আমি বিমুগ্ধ। আমি বিমোহিত। আমি উচ্ছ্বসিত। হঠাৎ পাহাড়ের কন্দর কেঁপে কেঁপে অদৃশ্য জগত থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো। গুরু গম্ভীর সে কণ্ঠ। বললো, যে ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীক রা.কে হিংসা করে সে যিন্দিক। যে ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাব রা.কে হিংসা করে সে জাহান্নামী। যে ব্যক্তি উসমান ইবনে আফফান রা.কে হিংসা করে তার প্রতিপক্ষ দয়াময় আল্লাহ। যে ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালেব রা.কে হিংসা করে তার প্রতিপক্ষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যে ব্যক্তি মুয়াবিয়া রা.কে হিংসা করে তাকে জাহান্নামের যাবানিয়া ফেরেশতারা টেনে নিয়ে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে।[৪]

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের স্বপ্ন

বলতে পার, কার খেলাফতকালে ন্যায় নীতি ও আদল-ইনসাফের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, এক ঘাটে একই সাথে বাঘ ও মেষ পানি করতো। অথচ বাঘ মেষকে হত্যা করতো না। মেরে ফেলতো না।

হ্যাঁ, তিনি হলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.। তিনি সত্য ও ন্যায়ের

---

৩ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪২

৪ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪০

নিরন্তর প্রতীক। যুহদ ও তাকওয়ার চিরন্তন নিদর্শন। তাই বিমোহিত মুসলিম উম্মাহ তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এক দিনের ঘটনা। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. ঘুমিয়ে আছেন। গভীর ঘুমে অচেতন। দীর্ঘক্ষণ ঘুমানোর পর হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁকে বেশ প্রফুল্ল মনে হল। বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। আবু বকর রা. ও উমর রা. তাঁর পাশে বসে আছেন। আমি তখন সালাম দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাঁদের পাশে বসে পড়লাম।

আমি নীরবে বসে আছি। কোন কথা নেই আমার মুখে। ঠিক তখন দেখলাম আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা. এলেন। তাঁরা একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

আমি বিস্মিত নয়নে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। ইতোমধ্যে দেখলাম, ঘরের দরজাটি খুলে গেল। আলী রা. ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলছেন–

قُضِیَ لِیْ و رَبِّ الْكعبة

কাবার রবের শপথ করে বলছি, আমার পক্ষে ফয়সালা হয়েছে। তারপর দেখলাম, মুয়াবিয়া রা. ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলছেন–

غُفِرَ لی و رب الْكعبةِ

কাবার ঘরের শপথ করে বলছি, আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।[১]

মুক্তার মালা

ইতিহাসের সোনালী পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে মুয়াবিয়া রা.-এর বিভিন্ন মূল্যবান উপদেশাবলী। তার কয়েকটি এখানে পত্রস্থ করা হলো। আশা করি, জীবন চলার পথে তা দেদীপ্যমান মাইলফলক হয়ে থাকবে।

* ইউনুস ইবনে হান্‌বাশ বলেন, আমি জুমআর দিন দামেস্কের মিম্বারে

---

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৩

বসে মুয়াবিয়া রা.কে বলতে শুনলাম–

হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা বুঝতে চেষ্টা কর। কারণ, তোমরা ইহকাল ও পরকালের বিষয়সমূহে আমার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ আর কাউকে পাবে না। তোমরা নামাযে তোমাদের চেহারা ও সারিগুলো সোজা রাখ। তা না হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের হৃদয়ের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। তোমরা তোমাদের নির্বোধদের চেপে ধরে সত্যের পথে অবিচল রাখ। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের দুশমনকে চাপিয়ে দেবেন। তারপর সে তোমাদের সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করবে। তোমরা দান করতে থাক। আর কেউ যেন না বলে, আমি তো কম সম্পদশালী। কারণ, অধিক সম্পদশালী ব্যক্তির দানের চেয়ে কম সম্পদশালী ব্যক্তির দান অতি উত্তম।

তোমরা সতী নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া থেকে দূরে থাক আর এ ধরনের কথা বলা থেকেও দূরে থাক, আমি শুনেছি আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তোমাদের কেউ নূহ আ.-এর যুগের কোন মহিলার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে অবশ্যই তাকে কেয়ামত দিবসে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[২]

* জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কিভাবে এত ধৈর্যশীল হলেন? তখন মুয়াবিয়া রা. বললেন, আমি লজ্জা পাই যে, আমার সহনশীলতার চেয়ে কারও পাপ অধিক হোক।[৩]

* একদা মুয়াবিয়া রা. তাঁর পরিবারবর্গের লোকদের ডেকে বললেন– হে উমাইয়ার সন্তানরা! সহনশীলতার সাথে কুরাইশদের মধ্য থেকে মজলিস থেকে উঠে আসবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, জাহেলী যুগে যদি আমি কারও সাথে সাক্ষাত করতাম আর সে আমাকে গালমন্দ করতো, আমি তার সাথে সহনশীলতার আচরণ করতাম। তারপর আমি ফিরে আসতাম আর সে আমার বন্ধু হয়ে যেত। তার নিকট আমি সাহায্য চাইলে সে সাহায্য করতো। আর যদি আমি ক্ষিপ্ত হতাম তাহলে সেও ক্ষিপ্ত হতো। সহনশীলতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মর্যাদাকে খাটো করে না। বরং তার মর্যাদাকে

---

[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৭

[৩]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৮

বৃদ্ধি করে।[১]

* অন্যত্র তিনি বলেছেন, মানুষ বুদ্ধিমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সহনশীলতা অজ্ঞতার উপর এবং ধৈর্য প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে। শুধুমাত্র সহনশীলতার গুণেই মানুষ বুদ্ধিমান হতে পারে।[২]

* জনৈক ব্যক্তি মুয়াবিয়া রা.কে জিজ্ঞেস করলো, লোকদের মাঝে নেতৃত্বের সবচেয়ে যোগ্য কে?

উত্তরে তিনি বললেন, মানুষের মাঝে যে সবচেয়ে বেশি দানশীল, মজলিসে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রবান আর অজ্ঞ মনে করা হলে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সহনশীল থাকে।[৩]

* একদা মুয়াবিয়া রা. তাঁর সহকারী প্রশাসক যিয়াদকে লিখে পাঠালেন– শোন, শুধু কোমলতা ও শীতলতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে না। তাহলে মানুষ দুঃসাহসী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে যাবে। আর কড়াকড়ি ও উষ্ণতার সাথেও রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে না, তাহলে মানুষ আত্মবিনাশে উদ্বুদ্ধ হবে, উৎসাহিত হবে।

সুতরাং তুমি মানুষের সাথে কড়াকড়ি করবে। কঠিন আচরণ করবে। আর আমি মানুষের সাথে দয়া মমতা ও কোমলতার আচরণ করবো। তাহলে মানুষ ভীত হয়ে পড়লে বাঁচার পথ খুঁজে পাবে।[৪]

* মুয়াবিয়া রা. মদীনায় এলেন। মসজিদে নববীর মিম্বারে বসে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ যা প্রদান করবেন তা প্রতিহত করার কেউ নেই। আর আল্লাহ যা প্রদান করেননি তা প্রদান করার কেউ নেই। মর্যাদাবান ব্যক্তিকে কেউ উপকার করতে পারবে না। মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত নেয়ামত। আর যার কল্যাণ কামনা করা হয় তাকে ধর্মের সুগভীর জ্ঞান প্রদান করা হয়।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথাগুলো বলতে

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৮

[২]. প্রাগুক্ত

[৩]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৯

[৪]. প্রাগুক্ত

শুনেছি। তিনি এই মিম্বারে বসে তা বলেছেন।[৫]

* মাকহূল রহ. বলেন, একদা মুয়াবিয়া রা. মিম্বারে বসে বললেন, হে লোক সকল! শিক্ষার মাধ্যমেই ইলম অর্জিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই ইসলামী বিধি-বিধানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়। আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে একমাত্র আলেমরাই ভয় করে। আমার উম্মতের মধ্য হতে একদল লোক সর্বদা সত্যে অবিচল থাকবে। তারা তাদের পরোয়া করবে না যারা তাদের বিরোধিতা করে; আর তাদেরও পরোয়া করবে না যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে। অবশেষে তারা আল্লাহর হুকুমে বিজয় লাভ করবে।[৬]

এক নজরে মুয়াবিয়া রা.

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম মুয়াবিয়া। উপনাম আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম সখর। উপনাম আবু সুফিয়ান। মাতার নাম হিন্দ। বংশ পরম্পরা এরূপ– মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস।

বংশগত মর্যাদা

ইসলাম-পূর্ব যুগেও মুয়াবিয়া রা.-এর বংশ বনু উমাইয়া গোটা আরবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান রা. কুরাইশ গোত্রের জাতীয় পতাকাবহনকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মক্কার সবচেয়ে ক্ষমতাধর সরদার।

ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মুয়াবিয়া রা. সন্তর্পণে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন ও তা গোপন রাখেন। পিতার ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করেননি। তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন নামকরা যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তদুপরি ইসলাম ও

---

[৫] হায়াতুস সাহাবা ৪/৩১২

[৬] হায়াতুস সাহাবা : ৪/৩১৩

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত কোন যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। বরং চিন্তা-চেতনায় তিনি মুসলমানদের সমর্থন করেছিলেন। নীরবে তাদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

মক্কা বিজয় ও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা

মক্কা বিজয়ের আগের দিন রাতে আবু সুফিয়ান রা. ইসলাম গ্রহণ করেন ও তখন মুয়াবিয়া রা. তার ইসলাম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করে। ইসলাম গ্রহণের পরই পিতা-পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জেহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তারা হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধের গনীমতের মাল হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একশত উট ও চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ/চাঁদি প্রদান করেন। তায়েফের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান রা.-এর এক চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

পিতা ও পুত্রের মদীনায় হিজরত

ইসলাম গ্রহণের পর তারা মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন। মুয়াবিয়া রা. তখন সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে পড়ে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে কোথাও যেতেন না। রাসূল বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে কাতিবে ওহী রূপে নিয়োগ করেন। রাসূলের পক্ষ হতে বিভিন্ন ফরমানও তিনি লিখতেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য বিভিন্ন দুআ করেছেন। তার মুক্তি কামনা করেছেন। শাসক হলে ইনসাফের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করার উপদেশ দিয়েছেন।

রাসূল সা.-এর ইন্তেকাল ও শামের পথে মুয়াবিয়া রা.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মদীনার আকাশে বিপর্যয়ের মেঘ দেখা দেয়। ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব ঘটে এদিকে সেদিকে। দলে দলে মানুষ মুরতাদ হতে থাকে। তখন মুয়াবিয়া রা. ভণ্ড

নবী মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁকে হত্যায় অংশ গ্রহণ করেন।

শামের রণাঙ্গনে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ও তার ভাই ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শামে গমন করেন। ইয়াযিদ রা. একটি অংশের সেনা প্রধান ছিলেন আর এই দলের অগ্রভাগের কমান্ড ছিল মুয়াবিয়া রা.-এর হাতে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে, মরজুস সুফারের বিজয়ে, দামেস্কের পতনে, বৈরুত, সৈদা, জাবীল, আরকা আক্রমণে তাঁর অবদানের কথা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। কায়সারিয়া অভিযানের সেই ভয়াবহ আক্রমণের কথা কেউ ভুলতে পারবে না।

শাসক মুয়াবিয়া রা.

১৮ হিজরীতে তার ভাই ইয়াযিদ রা. ইন্তেকাল করলে উমর রা. তাকে দামেস্ক ও জর্দানের শাসক নিয়োগ করেন। ২৩ হিজরীতে উমর রা. শাহাদাত বরণ করলে উসমান রা. তাঁর যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে গোটা শামের শাসক নিয়োগ করেন।

এরপর তাঁরই নির্দেশে অপরাজেয় তারাবুলুশ শাম পদানত হয়। জিহাদের ধারা অব্যাহত রেখে তিনি উমুরিয়া, শামশাত, মালাতিয়া, সাইপ্রাস, রোডসসহ বহু শহর ও বন্দর দখল করে ইসলামী খেলাফতের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং সর্বত্র ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক শাসক ব্যবস্থা কায়েম করেন।

সাবাঈ চক্রের উত্থান ও উসমান রা.-এর শাহাদাত

উসমান রা.-এর খেলাফতকালে ইহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইসলামের মুখোশ ধারণ করে খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। মিথ্যার ছড়াছড়িতে অনেকেই এ ষড়যন্ত্রের স্রোতে ভেসে যায়। ফলে ৩৫ হিজরীর ১৮ জিলহজ্জ রোজ শুক্রবার তিনি শাহাদতবরণ করেন। এরপর খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আলী রা.।

কিন্তু শহীদ খলীফার রক্তের দাবীতে ইসলামী বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সংঘটিত হয় জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন। হাজার হাজার যোদ্ধা এতে শাহাদতবরণ করেন। সাবাঈ চক্র এসব যুদ্ধে ইন্ধন দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। বরং তাদের কারণেই এ যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল।

খারিজীদের আবির্ভাব

সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ঘাপটি মেরে থাকা এই সাবাঈচক্র খারিজী নাম ধারণ করে পৃথক হয়ে যায়। তারা আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা.কে কাফের ঘোষণা দেয় আর যারা তাদের কাফের বলে বিশ্বাস করবে না তাদেরও কাফের বলে ঘোষণা দেয়। ফলে আলী রা. নাহরওয়ানের যুদ্ধে কয়েক দফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

মুয়াবিয়া রা.-এর উপর ঘাতকের হামলা ও আলী রা.-এর শাহাদাত

খারেজীরা এবার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করলো। তারা আলী রা. মুয়াবিয়া রা. ও আমর ইবনে আস রা.কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলো। সে মুতাবিক দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে তিনজনে তিন দিকে রওনা হয়।

মুয়াবিয়া রা.-এর ঘাতক তাঁকে আক্রমণ করলো বটে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে পারলো না। আর আলী রা.-এর ঘাতক তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হল।

হাসান রা.-এর খেলাফতের দাবী ও সন্ধি

আলী রা.কে সমাধিস্থ করার পর কুফাবাসীদের চাপের মুখে হাসান রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ-বিগ্রহকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে খেলাফতের কার্যক্রম থেকে পৃথক থাকার কথা ঘোষণা করেন ও উভয়ের মাঝে সন্ধি চুক্তি হয়। ফলে মুয়াবিয়া রা. গোটা মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিকারী হন।

এরপর তিনি খারিজীদের শায়েস্তা করার কাজে মনোনিবেশ করেন ও দীর্ঘকাল ধরে তাদের নির্মূলকরণে ব্যস্ত থাকেন। এ কারণেই খারিজীরা ও তাদের দোসররা সর্বকালে সর্বযুগে মুয়াবিয়া রা.-এর নিন্দা ও কুৎসা করে আসছে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হওয়ার পর আবার জিহাদের পতাকা নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী পৃথিবীর দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমধ্যসাগরের ঊর্মিমালা উপেক্ষা করে ইউরোপে আক্রমণ করে। কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। সুদূর আফ্রিকার উত্তরে আঘাত হানতে থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরে আক্রমণ করতে থাকে। এভাবে জিহাদের ধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

মুয়াবিয়া রা.-এর খেলাফতকালে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শান্তির হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল। কোথাও জুলুম অত্যাচারের চিহ্ন ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ ও দূরদর্শী যোদ্ধা। দানশীলতা, সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে তাঁর মত ব্যক্তি পাওয়া দুর্লভ।

তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। মাত্র তিন বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থেকে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি ফকীহ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলামের জটিল বিধি-বিধানের সমস্যার সমাধান দেয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল।

মুয়াবিয়া রা.-এর ইন্তেকাল

একাধারে ২০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অবশেষে ৬০ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর জীবনের শেষ উপদেশ বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার আমেজে ছিল টইটম্বুর। তিনি বলেছিলেন, 'রোমের টুটি চেপে ধর।'

স মা প্ত

আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা
শাহ হাকীম মোহাম্মদ আখতার সাহেব দা. বা. রচিত
হযরতের খলীফা মাওলানা আহমদ আলী অনূদিত
সদ্য প্রকাশিত আমাদের কয়েকটি বরকতময় বই।

মাকতাবাতুল আখতার
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা ও বিপনন কেন্দ্র]
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৯১৪০৫৪৭৬৯, ০১৭১৮৫২৭১০১